বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

www.parwana.net

ফেব্রুয়ারি ◆ ২০২৫

বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

৩২তম বর্ষ ■ ২য় সংখ্যা

ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ♦ মাঘ-ফাল্গুন ১৪৩১ ♦ শাবান ১৪৪৬

পৃষ্ঠপোষক
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আহমদ হাসান চৌধুরী

সম্পাদক
রেদওয়ান আহমদ চৌধুরী

নিয়মিত লেখক
আবু নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান
রহমান মুখলেস
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান
মারজান আহমদ চৌধুরী

বিভাগীয় সম্পাদক
মুহাম্মাদ উসমান গণি

সহ-সম্পাদক
মনজুরুল করিম মহসিন
মো. মাহমুদুল হাসান
জামান আহমদ

বিজ্ঞাপন ও বিপণন ব্যবস্থাপক
এস এম মনোয়ার হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
আহসান মাহমুদ

যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক পরওয়ানা
ফুলতলী কমপ্লেক্স ঢাকা
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
মোবাইল: ০১৭৯৩ ৮৭৭৭৮৮

সিলেট অফিস
পরওয়ানা ভবন
৭৪ শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ
সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০
মোবাইল: ০১৭৯৯ ৬২৯০৯০

parwanabd@gmail.com
www.parwana.net

মূল্য: ৩৫ টাকা

সূচিপত্র

তাফসীরুল কুরআন
আত-তানভীর/আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ্ (র.)
অনুবাদ: মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী ০৩

শারহুল হাদীস
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত বিষয়ের অনুসরণ/মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান ০৫

সাহাবা
হযরত আলী (রা.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কারামত/মাওলানা মো. ছালিক আহমদ (র.) ০৭

প্রবন্ধ
হাদীসের আলোকে শবে বরাতের ফদীলত ও আমল/মো. আবদুল আউয়াল হেলাল ০৯
প্রাণীর মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণ : ইসলাম বনাম প্রগতিশীলতা/মারজান আহমদ চৌধুরী ১৩
রাসূল পাকের শানে শব্দচয়নের আদব/মুহাম্মাদ সায়ীদ ১৬
আমার দেখা একজন শাইখুল হাদীস/মোহাম্মদ খছরুজ্জামান ১৮
জুমুআর দিনের বিশেষ আমল/ইবরাহীম আরিফ ১৯

অনুবাদ
কুরআন তিলাওয়াতের আদব/মূল: হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ হামিদ আল গাযালী (র.)
অনুবাদ: ইমাদ উদ্দীন তালুকদার ২৭

আন্তর্জাতিক
তুফান শেষে গাযায় প্রত্যাবর্তন/মুহাম্মাদ বিন নূর ৩০

নিয়মিত
এই মাসে এই চাঁদে ৩২
জীবন জিজ্ঞাসা ৩৩
খাতুন ৩৬
বিজ্ঞান ৩৭
এক নজরে গতমাস ৩৮
কবিতা ৪০
আবাবীল ফৌজ ৪১
সম্পাদকীয় ০২

সম্পাদক কর্তৃক বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল
ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত এবং সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

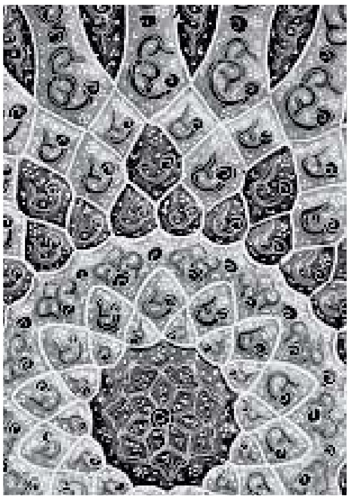

نحمده ونصلى على رسوله الكريم– اما بعد

হিজরী বর্ষের অষ্টম মাস শাবান। নানা দিক বিবেচনায় এ মাস অত্যন্ত ফদ্বীলতপূর্ণ। রাসূলে পাক (সা.) এ মাসকে তাঁর নিজের মাস বলে উল্লেখ করেছেন। রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের অনন্য সওগাত মাহে রামাদ্বানের প্রস্তুতি পর্ব এ মাসেই শুরু হয়ে থাকে। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজব ও শাবান মাসে আল্লাহর নিকট দুআ করতেন- হে আল্লাহ! আমাদের রজব ও শাবান মাসের বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে রামাদান পর্যন্ত পৌঁছে দিন। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) শাবান মাসের চাঁদ দেখে কুরআন কারীম বেশি বেশি তিলাওয়াত করতেন, নিজেদের সম্পদ হতে যাকাতের মাল পৃথক করে রাখতেন। যাতে গরীব ও মিসকীন উপকৃত হতে পারে এবং রামাদানের রোযা রাখার জন্য তা ওয়াসীলাহ হয়ে যায়।

মাহে রামাদানের প্রস্তুতি ছাড়াও শাবান মাসের অনন্য মর্যাদার প্রধান দিক হল, এ মাসে এমন একটি রজনি রয়েছে যার মার্যাদা অপরিসীম। লাইলাতুল বারাআত বা শবে বরাত নামে এ রজনি সুপরিচিত। হাদীসে নববীতে এ রজনি ‘লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান’ বা শাবানের মধ্য রজনি হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। হাদীস শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী এ রাতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি রহমত, বরকত ও ক্ষমা অবতীর্ণ হয়, নেকীর দরজা খুলে দেন, বান্দার দুআ কবুল করেন। এ রাতেই মানুষের জীবন-মৃত্যুর ফয়সালা হয়, ভাগ্যলিপি নির্ধারিত হয়, রিযক অবতীর্ণ হয় । হযরত আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। অতঃপর শিরকে লিপ্ত অথবা নিজের ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতিত সকলকে ক্ষমা করে দেন। উমার ইবন আবিল আস (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যখন মধ্য শাবানের রাত তথা শবে বরাত আগমন করে তখন একজন আহবানকারী আহবান করতে থাকেন ‘কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছো কি? আমি তাকে ক্ষমা করব, কোন যাচনাকারী আছো কি? আমি তাকে দান করব।’ শিরকে লিপ্ত ও ব্যভিচারী ব্যতীত যত লোক যা চাইবে সকলকেই তাদের প্রার্থনা পূরণ করে দেওয়া হবে। উল্লিখিত হাদীস ছাড়াও বিভিন্ন হাদীসে শবে বরাতের মহান মর্যাদার কথা সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। তাছাড়া অনেক হাদীসে এ রাতের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে । শবে বরাতের কর্তব্যকর্মের মধ্যে রয়েছে- ইবাদতের উদ্দেশ্যে রাত্রি জাগরণ, দুআ, ইস্তিগফার করা, কবর যিয়ারত করা ও দিনে সাওম পালন করা ইত্যাদি। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন তোমরা রাতে (ইবাদত ও সালাতে) দন্ডায়মান থাকো এবং দিনে সাওম পালন কর। শবে বরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিদ্রা ছেড়ে ইবাদতে নিমগ্ন থেকেছেন। জান্নাতুল বাকী কবর স্থানে গিয়ে মুমিন নর-নারী ও শহীদগণের জন্য মাগফিরাত কামনা করেছেন। দীর্ঘ সিজদাসহ দীর্ঘ সালাত আদায় করেছেন। সিজদায় গিয়ে আল্লাহর দরবারে তাঁর সন্তুষ্টি, ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। সুতরাং আমাদের যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে এ রাতের কল্যাণ ও বরকত লাভে নিবিষ্ট হতে হবে। আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে কৃত গুনাহের জন্য যেমন ক্ষমা চাইতে হবে, তেমনি অনাগত ভবিষ্যত যেন সুন্দর সত্যাশ্রয়ী ও সুখের হয় সে জন্য বিনীত প্রার্থনা করতে হবে। বিশেষত গাফিলতির নিদ্রা ছেড়ে মুমিনরা যেন জাগ্রত হয়ে ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হয় সেজন্য আল্লাহর দরবারে কাকুতি মিনতি করতে হবে। মনে রাখতে হবে আমাদের প্রার্থনা তখন কবূল হবে যখন আমাদের মধ্যে এমন কোন বদগুণ থাকবে না, যা দুআ কবূলের অন্তরায় হয়। শবে বরাত প্রাসঙ্গিক একটি হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ রাতে আল্লাহ তায়াল বনূ কালব গোত্রের বকরীসমূহের লোম পরিমাণ মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন। কিন্তু মুশরিক, হিংসুক, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী, মাতা-পিতার অবাধ্য এবং সর্বদা মদপানে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না।

মহিমান্বিত শবে বরাতে আমাদের প্রার্থনা, আল্লাহ আমাদের প্রতি বিশেষতঃ মুসলিম উম্মাহর প্রতি রহমতের নযর করুন। মৃত্যু পর্যন্ত এমন সব গুনাহ থেকে হিফাযত করুন যা তাঁর করুণা লাভে বাধা সৃষ্টি করে। মুসলিম উম্মাহ, আমাদের দেশ ও জাতি শবে বরাতে অফুরান কল্যাণ লাভে ধন্য হোক। আমীন।

আত্‌-তানভীর

আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী
ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)

অনুবাদ
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ– يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ– إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ– وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ–

অনুবাদঃ আর যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, হায়! যদি একবার আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটতো তবে আমরাও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো। এভাবে আল্লাহ তাদের কার্যাবলী তাদের পরিতাপরূপে তাদেরকে দেখাবেন আর তারা কখনো অগ্নি থেকে বের হতে পারবে না। হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা যা জানো না, এমন সব বিষয় বলার নির্দেশ দেয়। যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তোমরা অনুসরণ করো। তারা বলে, না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তা-ই অনুসরণ করবো। এমনকি তাদের পিতৃপুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝতো না এবং তারা সৎপথে পরিচালিত ছিল না। (সূরা বাকারা, আয়াতঃ ১৬৭-১৭০)

তাফসীরঃ

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا

-আর যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, হায়! যদি একবার আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটতো তবে আমরাও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো। এভাবে আল্লাহ তাদের কার্যাবলী তাদের পরিতাপরূপে তাদেরকে দেখাবেন আর তারা কখনো অগ্নি থেকে বের হতে পারবে না।

আর তখন অনুসারীগণ বলবে, যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ঐ সকল নেতাদেরকে সাহায্যকারী মনে করত, যারা তাদের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহর নাফরমানী করত তারা যখন আখিরাতে আল্লাহর আযাব দেখবে তখন তারা আফসোস করে বলবে, لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً আহ! আল্লাহ যদি আমাদেরকে দুনিয়াতে আর একটা মুহূর্ত ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিতেন বা দুনিয়াতে একটি মুহূর্তের জন্য ফিরে যেতে পারতাম।[১]

হযরত রাবী (রা.) বলেন, তাবেদারকারীরা বলবে আমাদেরকে যদি দুনিয়াতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হত, তাহলে আমরা দুনিয়াতে তাদের থেকে পৃথক হয়ে যেতাম, যেমন তারা এখন আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেছে। হযরত কাতাদাহ (রা.)ও একই ধরনের বর্ণনা করেন।[২]

فنتبرا এখানে نصب হয়েছে, কারণ এটা দ্বারা تمني এর جواب হয়েছে। আর تمني হচ্ছে حرف لو যা অসম্ভব কিছু বোঝানোর জন্যে আসে। কারণ তারা প্রত্যাশা করবে দুনিয়াতে ফিরে আসতে। তাদের এ কামনার কারণ হলো, দুনিয়ায় এসে তারা সম্পর্ক ছিন্ন করবে ঐসব লোকদের সাথে, যাদেরকে তারা ইহকালে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে অনুসরণ করত, যখন কিয়ামতের দিন আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তি দেখে নেতাগণ তাদের অনুসারীদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে।[৩]

كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ

-হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

যেভাবে তাদেরকে আযাব দেখানো হয়েছে যা আল্লাহর বাণী وَرَأَوُ الْعَذَابِ উল্লেখ করা হয়েছে, তারা দুনিয়াতে যে মিথ্যা বলত, ঠিক তেমনি তাদেরকে প্রদর্শন করানো হবে তাদের খারাপ ও অসৎ প্রকৃতির কার্যাবলীও। যার জন্য তারা শাস্তির হকদার হয়েছে। অর্থাৎ এজন্য তারা লজ্জিত হবে।[৪]

حسرات বহুবচন, এর একবচন হচ্ছে حسرة। কারণ আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী যে একবচন বিশেষ্য فعلة এর ওজনে ব্যবহার হয় অর্থাৎ প্রথম হরফ فتحه বা জবর এবং দ্বিতীয় حرف সাকিন হয় তার বহুবচন فعلات

এর ওজনে আসে। যেমন شهوة এবং ثمرة এর বহুবচন شهوات এবং ثمرات ব্যবহার হয়।[৫]

হযরত সুদ্দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাদেরকে জান্নাত দেখানো হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতে, তাহলে তোমরাও এ জান্নাতে যেতে। অতঃপর মুমিনদের মধ্যে জান্নাত বন্টন করে দেওয়া হবে আর কাফিরগণ এ কথায় লজ্জিত হবে।[৬]

হযরত আবদুল্লাহ বলেন, সেদিন প্রত্যেকেই জান্নাত ও জাহান্নামের বাসস্থান প্রত্যক্ষ করবে। সেদিন হলো আফসোসের দিন। দুযখীগণ সেদিন বেহেশতীগণকে দেখবে। তাদেরকে বলা হবে, যদি তোমরাও আমল করতে তাহলে অনুরূপ নিআমত ভোগ করতে। তখন তারা আফসোস করবে। অপরদিকে মুমিনগণ যখন দুযখের বাসস্থান অবলোকন করবে তাদেরকে বলা হবে যদি আল্লাহর অনুগ্রহ তোমার উপর না হত, তাহলে এটিই হত তোমার আবাসস্থল।[৭]

হযরত রবী বলেন, তখন তারা তাদের মন্দ কাজের জন্য আফসোস করবে।[৮]

وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ

অর্থাৎ তাদেরকে দুযখ হতে বের করা হবে না। এখানে কাফির, মুশরিক এবং গোমরাহ ব্যক্তি এমন কোন সম্প্রদায়কে নির্দিষ্ট করা হয়নি। অধিকন্তু সময়ও নির্দিষ্ট করা হয়নি। কতদিন এবং কখন শেষ হবে তা কিছু স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

মোটকথা, সেদিন নেতা পর্যায়ের মুশরিকদের অনুসারীরা বলবে, যদি আমরা দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে যেতে পারতাম, তাহলে আমরা এসব মাতব্বর থেকে পৃথক থাকতাম, যেমন তারা এখানে আমাদের থেকে পৃথক হয়েছে। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আমলের ফল দেখাবেন, যা তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে। তাদেরকে কখনো দুযখ হতে বের করা হবে না।[৯]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

-সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা যা জানো না, এমন সব বিষয় বলার নির্দেশ দেয়।

এখানে طَيِّبًا শব্দ দ্বারা আল্লাহ তাআলা বুঝাতে চেয়েছেন যা পবিত্র, নাপাক নয় এবং হারাম নয় তা খেতে হবে। আর خطوات শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হলো- خطوة অর্থাৎ পদক্ষেপ বা পদাঙ্ক।[১০]

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এর অর্থ হচ্ছে শয়তানের আমল।[১১]

হযরত মুজাহিদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- এর অর্থ গোনাহ বা দোষ। হযরত কাতাদাহ (রা.) ও হযরত মুজাহিদ এর অনুরূপ বলেছেন।[১২]

সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, আয়াতের অর্থ হচ্ছে শয়তানের অনুসরণ না করা বা আনুগত্য না করা।[১৩]

আর হযরত আবূ মুজালিয হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের অর্থ বলেন- আল্লাহ তাআলার নাফরমানী হতে ভয় করা।[১৪]

তাহলে আল্লাহ তাআলার বাণীর অর্থ- হে মানব সম্প্রদায়! আমি আমার রাসূলের ভাষ্য অনুযায়ী যেসব খাবার তোমাদের জন্য হালাল করেছি তা তোমরা খাও। তোমরা بحيرة سائبة وصيلة এবং অনুরূপ যেসকল প্রাণী নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছ, তা কিন্তু আমি তোমাদের জন্য পবিত্র করে দিয়েছি। অপরদিকে আমি তোমাদের জন্য যেসকল খাবার হারাম করে দিয়েছি যেমন- মৃত পশুর রক্ত, শুকরের গোশত এবং আমার নাম ব্যতীত অন্য নাম নিয়ে যে প্রাণী জবেহ করা হয়েছে অনুরূপ প্রাণী, এগুলো খাওয়া হতে বিরত থাক। তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ ছেড়ে দাও। যে শয়তান তোমাদের ক্ষতি করবে, তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে। তারা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তোমাদের হালাল মালকে হারাম বলবে। তারা যা বলবে, তোমরা তা ত্যাগ কর এবং আমারই অনুসরণ কর।

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

-যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তোমরা অনুসরণ করো। তারা বলে, না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তা-ই অনুসরণ করবো। এমনকি তাদের পিতৃপুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝতো না এবং তারা সৎপথে পরিচালিত ছিল না।

তারা তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজ করার নির্দেশ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই দিতে পারবে না। السوء শব্দের অর্থ আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করার নির্দেশ, আর الفحشاء শব্দ দ্বারা 'যিনা' বুঝানো হয়েছে।[১৫]

আর وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ এর অর্থ হচ্ছে তারা وصيلة ومسائبة بحيرة حام এসব প্রাণীকে নিজের জন্য হারাম করে নিত। তারা ধারণা করত, এসব জিনিস আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন। অথচ আল্লাহ তাআলা পরিষ্কারভাবে বলেছেন-

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

-বাহীরা, সায়িবা, ওসীলা ও হাম আল্লাহ নির্ধারণ করেননি। কিন্তু কাফিরগণ আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে। তাদের অধিকাংশই বুঝে না। (সূরা মায়িদা, আয়াত-১০৩) তারা যে বলে আল্লাহ এগুলো হারাম করেছেন তা নিতান্ত মিথ্যা কথা। তাদেরকে এভাবে বলার জন্য শয়তানই শুধু নির্দেশ করে।[১৬]

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

আর যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা অনুসরণ কর আল্লাহ তাআলার প্রেরিত ওহীর। তখন তারা বলে, 'না' আমরা এমন জিনিসের অনুসরণ করব, যা আমাদের বাপ-দাদা থেকে পেয়েছি। অথচ তাদের বাপ-দাদার কোনো জ্ঞানও ছিল না এবং তারা হিদায়াত প্রাপ্তও ছিল না। অর্থাৎ যখন হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর অনুসরণ করার জন্য তাদেরকে বলা হত, তখন তারা বলত, আমরা আমাদের বাপ-দাদার পথের অনুসরণ করব, যদিও তাদের পূর্বপুরুষ অজ্ঞাত ও গোমরাহ ছিল। কারণ তারা শিরক এর উপর ছিল।

১. তাবারী, ৩/২৯৩; ২. তাবারী, ৩/২৯৪; ৩. প্রাগুক্ত; ৪. তাবারী, ৩/২৯৫; ৫. প্রাগুক্ত; ৬. তাবারী, ৩/২৯৬; ৭. তাবারী, ৩/২৯৭; ৮. তাবারী, ৩/২৯৮; ৯. তাবারী, ৩/২৯৯; ১০. তাবারী, ৩/৩০১; ১১. প্রাগুক্ত; ১২. প্রাগুক্ত; ১৩. তাবারী, ৩/৩০২; ১৪. প্রাগুক্ত; ১৫. তাবারী, ৩/৩০৩; ১৬. তাবারী, ৩/৩০৩-৩০৪।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত বিষয়ের অনুসরণ

মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

হাদীসের মূল ভাষ্য

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ.

অনুবাদ

হযরত আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার চাহিদা আমি যা নিয়ে এসেছি এর অনুকূলে না হবে। (আমর ইবনু আবী আসিম আদ দাহকাক, কিতাবুস সুন্নাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩, হাদীস-১৫; ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাতুল কুবরা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯৮, হাদীস-২৯১)

হাদীসের ব্যাখ্যা

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল। তাঁর আনীত দ্বীন ইসলাম, আসমানী গ্রন্থ কুরআন এবং খোদায়ী নির্দেশনার আলোকে পরিচালিত তাঁর জীবনধারা তাঁর সুন্নাহ। একজন মুসলমানের জন্য কুরআন-সুন্নাহর বিধি-বিধান তথা ইসলামী শরীআ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা আবশ্যক। যার জীবনধারা ও সকল চাহিদা প্রিয়নবী ﷺ এর আনীত দ্বীনের পূর্ণ অনুগামী হবে তিনি পূর্ণ ঈমানদার হিসেবে গণ্য হবেন। অন্যথায় তিনি পূর্ণ ঈমানদার হিসেবে গণ্য হবেন না। যেমন- প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ.

-তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ তার চাহিদা আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুগামী না হবে।

হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ لَا يُؤْمِنُ (অর্থাৎ সে ঈমানদার হবে না) শব্দ উল্লেখ করেছেন। এর ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেছেন, এখানে মূল ঈমানকে নাকচ করা হয়নি। বরং পরিপূর্ণতাকে নাকচ করা হয়েছে। অর্থাৎ এর অর্থ হবে, সে ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার হবে না, যার প্রবৃত্তি আমার আনীত বিষয়ের অনুগামী না হবে।

হাদীসে هَوٰى শব্দ উল্লেখিত হয়েছে। শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- প্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা, ইচ্ছা, আবেগ, অনুরাগ ইত্যাদি। এর সম্পর্ক যেমন ভালো'র প্রতি হয়, তেমনি মন্দের প্রতিও হয়। তবে সাধারণভাবে هَوٰى বলতে মন্দ প্রবৃত্তিই বুঝায়। এখানে هَوٰى বলতে ব্যক্তির সকল চাহিদা, কামনা-বাসনা উদ্দেশ্য।

ঈমানের দাবি হলো, একজন মুমিনের সকল চাহিদা, কামনা-বাসনা, আবেগ-অনুরাগ ইসলামের অনুগামী হবে, প্রিয়নবী ﷺ এর আনীত দ্বীন ও তাঁর প্রদত্ত নির্দেশনার অনুকূল হবে। প্রিয়নবী ﷺ খোদায়ী নির্দেশনার আলোকে যা করতে আদেশ করেছেন একজন মুমিন নির্দ্বিধায় তা করবে এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে সর্বান্তকরণে বেঁচে থাকবে। এর ব্যত্যয় করার সুযোগ কোনো ঈমানদারের নেই। যে মুমিন আপন জীবনের সকল কামনা-বাসনা ও চাহিদাকে প্রিয়নবী ﷺ এর আনীত জীবন-বিধানের অনুগামী করে নিবেন তিনি ঈমানের দিক থেকে পরিপূর্ণতা অর্জন করবেন। আর এক্ষেত্রে যার ত্রুটি থাকবে তিনি পাপাচারী হিসেবে গণ্য হবেন। আলোচ্য হাদীসের সারকথা হলো এটি।

আল্লামা ইবন দাকীক আল ঈদ (র.) বলেছেন, এই হাদীস আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর অনুরূপ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

-তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর

অর্পণ না করে। (সূরা নিসা, আয়াত-৬৫)

এ আয়াতের শানে নুযূল হলো, হযরত যুবাইর (রা.) ও জনৈক আনসারীর মধ্যে পানি নিয়ে ঝগড়া সৃষ্টি হয়। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট নালিশ পেশ করেন। তখন রাসূল ﷺ যুবাইর (রা.)-কে বললেন, “হে যুবাইর! তোমার যমীনে (প্রথমে) সিঞ্চন করে নাও। এরপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দাও।” রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলে উদারতা প্রদর্শন ও বিষয়টি সহজভাবে নেওয়ার জন্য যুবাইর (রা.) কে উৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু এতে আনসারী (অসন্তুষ্ট হয়ে) বলল, ‘সে তো আপনার ফুফাতো ভাই’। একথা শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর চেহারায় অসন্তুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পেল। এরপর তিনি বললেন, “হে যুবাইর! তুমি নিজের জমি সিঞ্চন কর। তারপর পানি আটকিয়ে রাখ, যাতে তা বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে, এরপর ছেড়ে দাও।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে আনসারী ব্যক্তির যাতে কল্যাণ হয় এমন নির্দেশ যুবাইর (রা.) কে দিয়েছিলেন। কিন্তু আনসারী ব্যক্তি যখন (এ নির্দেশ না মেনে কটু কথা বলে) রাসূলুল্লাহ ﷺ কে রাগান্বিত করে ফেলে তখন যুবাইর (রা.) এর প্রাপ্য হক অনুযায়ী ফয়সালা প্রদান করেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ইবন দাকীক আল ঈদ, শারহুল আরবাঈন, পৃষ্ঠা: ১০৭-১০৮)

উপরোল্লিখিত আয়াতের সারকথা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ফায়সালা নির্দ্বিধায় মানা একজন মুমিনের ঈমানের দাবি। যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ফায়সালা মানে না সে মুমিন নয়। আলোচ্য হাদীসের মর্মও এটি।

আল্লামা ইবন হাজার হাইতামী (র.) বলেছেন, নবী করীম ﷺ ‘সত্য’ নিয়ে আগমন করেছেন এবং পূর্বের রাসূলদের সত্যায়ন করেছেন (যা পবিত্র কুরআনে আছে)। যদি ‘সত্য’ বলতে দ্বীন উদ্দেশ্য হয় তাহলে এর মধ্যে ঈমান, ইসলাম অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর কিতাব, মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য কল্যাণ কামনা এবং ইস্তিকামাত তথা দ্বীনের উপর টিকে থাকা সবই অন্তর্ভুক্ত। এগুলো দ্বীনের সমন্বিত মৌলিক বিষয়। এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া বাইরে আর কিছু থাকে না। আর ‘সত্য’ বলতে যদি তাকওয়া উদ্দেশ্য হয় তবে এর মধ্যেও উপরোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এর ভিত্তিতে বলা যায়, নবী করীম ﷺ যে দ্বীন ও তাকওয়া নিয়ে এসেছেন মানুষের কামনা-বাসনা এর অনুগামী হবে। আর হাদীস থেকে জানা যায়, যার প্রবৃত্তি তথা চাহিদা ও কামনা-বাসনা নবী করীম ﷺ যা নিয়ে এসেছেন এর পূর্ণ অনুসারী হবে সে মুমিনে কামিল তথা পূর্ণ ঈমানদার। অপরপক্ষে, নবী করীম ﷺ ঈমানসহ অন্যান্য যেসকল বিষয় নিয়ে এসেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানসহ উক্ত সকল বিষয় থেকে বিমুখ থাকে সে কাফির। আর যে কিছু অনুসরণ করে আর তার অনুসৃত বিষয় দ্বীনের মূল তথা ঈমান হয় আর এছাড়া অন্য বিষয় সে পরিত্যাগ করে সে ফাসিক। এর বিপরীত হলে অর্থাৎ ঈমান না এনে বাহ্যিক অন্যান্য বিষয় অনুসরণ করলে সে মুনাফিক। (হাইতামী, আল ফাতহুল মুবীন, পৃষ্ঠা-৬২১)

শেষকথা হলো, প্রিয়নবী ﷺ এর যথাযথ অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে ঈমানের পরিপূর্ণতা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর প্রিয় হাবীব ﷺ কে যথাযথভাবে অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সাহাবা

হযরত আলী (রা.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কারামত

মাওলানা মো. ছালিক আহমদ (র.)

নাম আলী। পিতার নাম আবূ তালিব। উপনাম বা কুনিয়াত আবুল হাসান ও আবূ তুরাব, আল কুরাইশী। অধিকাংশ মতানুযায়ী তিনিই হচ্ছেন পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স কত বছর ছিল এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কারো মতে দশ বছর, কারো মতে পনের বছর, কেউ কেউ বলেছেন ষোল বছর আবার কেউ কেউ আঠারো বছর ছিল বলেও অভিমত পোষণ করেছেন। তিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই। উপাধি আসাদুল্লাহ ও আমীরুল মুমিনীন। তাবূকের যুদ্ধ ব্যতীত তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাবূকের যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আহলে বাইতের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মদীনায় রেখে যান এবং এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, আলী! তুমি কি তাতে সন্তুষ্ট নও যে তোমার সম্পর্ক আমার সাথে এমন, যেরূপ সম্পর্ক ছিল হযরত হারূন (আ.) এর হযরত মূসা (আ.) এর সাথে। তবে জেনে রেখো, আমার পরে আর কোনো নবীর আগমন ঘটবে না। তিনি ছিলেন রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কনিষ্ঠা কন্যা, জান্নাতী নারীদের সরদার, নবী নন্দিনী হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (রা.) এর স্বামী ও হযরত ইমাম হাসান-হুসাইনের পিতা, আহলে বাইতে রাসূলের অন্যতম সদস্য। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সেরা যোদ্ধা, আলিম ও বিচারক। তিনি হযরত উসমান (রা.) এর শাহাদাতের পর পয়ত্রিশ হিজরী সনের পবিত্র যিলহজ্জ মাসে শুক্রবার দিন মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলীফা হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। চল্লিশ হিজরী সনে রামাদানে পবিত্র জুমুআর দিন ফজরের নামাযে মসজিদে যাওয়ার পথে কুখ্যাত খারিযী আব্দুর রহমান ইবন মুলযিম ওৎ পেতে উপর্যুপরি তরবারীর আঘাতে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করে আহত করে। আহত হওয়ার তিনদিন পর তিনি কূফায় শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর প্রিয় ছেলে হযরত হাসান-হুসাইন ও ভাতিজা আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রা.) তাকে গোসল দেন। তাঁর বড় ছেলে হযরত হাসান (রা.) নামাযে জানাযার ইমামতী করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর, মতান্তরে ৫৮, ৬৫ ও ৭০ বছর। তাঁর খিলাফতকাল ছিল প্রায় পাঁচ বছর।

তাঁর মর্যাদায় বর্ণিত হাদীস

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.) এর মর্যাদায় বর্ণিত বহু হাদীস হাদীসের কিতাবসমূহে পাওয়া যায়। নিম্নে দুটো হাদীস উল্লেখ করা হলো।

عن زر بن حبيش قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رضى الله عنه وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ: أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ. (رواه مسلم؛ مشكوة، ص–٣٦٥)

-হযরত যির ইবন হুবাইশ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী বলেন, শপথ সেই সত্তার, যিনি বীজ থেকে উদ্ভিদ নির্গত করেছেন, প্রাণী জগত সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাঁর উম্মী নবীকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মুমিন ব্যতীত কেউ আমাকে ভালোবাসবে না এবং মুনাফিক ব্যতীত কেউ আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করবে না। (মুসলিম; মিশকাত, পৃষ্ঠা ৫৬৩)

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا فِيهِمْ عَلِيٌّ، قَالَتْ: فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُولُ: اللّٰهُمَّ لَا تُمِتْنِي حَتَّى تُرِيَنِي عَلِيًّا. (رواه الترمذى؛ مشكوة، ص–٤٦٥)

-হযরত উম্মু আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো এক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) কে প্রেরণ করলেন। তখন আমি শুনতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হস্তযুগল উত্তোলন করে দুআ করছেন এবং বলছেন, হে আল্লাহ! আলীকে পুনরায় না দেখিয়ে তুমি আমার মৃত্যু দান করো না। (তিরমিযী; মিশকাত, পৃষ্ঠা ৫৬৪)

হযরত আলী (রা.) এর কারামত

- ইমাম তাবারানী 'আল আওসাত' কিতাবে এবং আবূ নুআইম তাঁর 'আদদালাইল' কিতাবে যাযান (র.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) একদা কিছু কথোপকথন করলেন, তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন তাকে মিথ্যারোপ করল। তখন হযরত আলী (রা.) তাকে বললেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকো তাহলে আমি কি তোমাকে বদদুআ করব? উত্তরে লোকটি বলল, বদদুআ করতে পারো। তখন তিনি তার উপর বদদুআ করলেন, ফলে উক্ত মিথ্যুক ব্যক্তি উক্ত মজলিস থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বেই অন্ধ হয়ে গেল। (তারীখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ১২৫)

- হযরত ইমাম জাফর সাদিক (রা.) স্বীয় পিতা ইমাম মুহাম্মদ বাকির (র.) থেকে বর্ণনা করেন, দু'ব্যক্তি তাদের বিরোধ মীমাংসা করানোর জন্য হযরত আলী (রা.) এর দরবারে আগমন করল। হযরত আলী (রা.) একটি দেয়ালের পাদদেশে তাদেরকে নিয়ে বসে গেলেন। ইত্যবসরে জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল, দেয়ালটি বিধ্বস্ত হতে যাচ্ছে। তখন হযরত আলী (রা.) বললেন, তোমরা তোমাদের বক্তব্য চালিয়ে যাও আল্লাহই আমাদের রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর তিনি দু'জনের বিষয়টি নিষ্পত্তি করে উঠার পর দেয়ালটি বিধ্বস্ত হয়ে গেল। হযরত আবূ নুআইম তার 'আদদালাইল' নামক গ্রন্থেও তা বর্ণনা করেছেন। (কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০২)
- হযরত ইমাম জাফর সাদিক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রামাদান মাস আগমন করল, হযরত আলী (রা.) একদিন হযরত হাসান (রা.), একদিন হযরত হুসাইন (রা.) ও অপরদিন হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রা.) এর সাথে ইফতার করতেন এবং দু'তিন লোকমার বেশি খেতেন না। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো আপনি এত কম খাওয়ার কারণ কী? উত্তরে বললেন, আমার হায়াত আর বেশি বাকি নেই। আর আমি চাই আমার এ স্বল্প খাবার গ্রহণের মধ্যেই যেন আল্লাহর আদেশ এসে যায় অর্থাৎ আমি মৃত্যুবরণ করি। অতঃপর তিনি উক্ত রাত্রেই শাহাদাতবরণ করেন। (কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৯)
- হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, আমার প্রিয়তম রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে স্বপ্নযোগে সাক্ষাৎ নসীব হলো। তখন আমি আমার প্রতি ইরাকবাসীদের বিরুদ্ধাচরণ ও কষ্টের কথা তাঁর নিকট তুলে ধরলাম। স্বপ্নে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি শীঘ্রই এ কষ্ট থেকে মুক্তি দানের আশ্বাস দিলেন। এ স্বপ্ন দেখার তিনদিন পর তিনি শাহাদাতবরণ করেন। (কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১১)
- হযরত আসিম বিন দ্বামরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হযরত হাসান (রা.) তার এক বক্তৃতায় বলেন যে, আমার পিতা হযরত আলী (রা.) কে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো যুদ্ধে প্রেরণ করতেন তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর ডানে এবং হযরত মীকাঈল (আ.) তাঁর বামে থাকতেন। ফলে তিনি যুদ্ধে (অতি সহজেই) বিজয় লাভ করতেন। (কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১২)
- হযরত আবূ রাফি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (খাইবার বিজয়ের দিন) হযরত আলী (রা.) এর সঙ্গে ছিলাম, যখন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কামূস দুর্গ বিজয়ের জন্য) তাঁর হাতে ইসলামের পতাকা তুলে দিয়েছিলেন। তিনি যখন দুর্গের নিকটবর্তী হলেন তখন তার অধিবাসীরা বের হয়ে আসলো এবং তাঁর সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। এমতাবস্থায় ইয়াহুদীদের এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা.) এর উপর আক্রমণ করে তার হাত থেকে ঢাল ফেলে দিল। তখন হযরত আলী (রা.) দুর্গের একটি দরজা টান মেরে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন, ফলে আল্লাহ পাক তাঁদেরকে বিজয় দান করলেন। যুদ্ধ শেষে দরজাটি দূরে নিক্ষেপ করে দিলেন। হযরত আবূ রাফি (রা.) বলেন, উক্ত যুদ্ধে আমার সাথে আরও সাতজন ছিলেন। আমরা এ আটজন মিলে পরবর্তীতে উক্ত দরজাটিকে উলটানোর চেষ্ট করি (যে দরজাটি হযরত আলী (রা.) এক হাত দিয়ে যুদ্ধে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।) কিন্তু আমরা আটজন মিলেও তা উলটাতে পারিনি। এটা ছিল শেরে খোদা হযরত আলী (রা.) এর একটি সুস্পষ্ট কারামত। (আহমদ)
- ইমাম বাইহাকী (র.) দালাইলুন নুবুওয়াত গ্রন্থে হযরত আলী (রা.) থেকে দীর্ঘ বর্ণনার শেষে উল্লেখ করেন, যখন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত হলো তখন কান্নাকাটি শুরু হলো এমতাবস্থায় সাহাবায়ে কিরাম ঘরের এক কোণ থেকে একটি আওয়াজ শুনলেন, তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ তাআলা সকল সমস্যা দূরীভূত করেন, তিনি তার বান্দাদের সকল চিন্তা দূর করেন, সকল হারানো বস্তুর তিনিই উত্তম প্রতিদান হয়ে থাকেন। সুতরাং তাঁকেই ভয় কর এবং তাঁর নিকটই প্রত্যাশা করো। কেননা বিপদগ্রস্ত তো সেই ব্যক্তিই হয়ে থাকে, যে সাওয়াব বা পূণ্য থেকে বঞ্চিত হয়। তখন হযরত আলী (রা.) উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি চিনতে পেরেছ তিনি কে? তিনি হচ্ছেন হযরত খাদ্বির (আ.)।
- হযরত আলী (রা.) কর্তৃক হযরত খাদ্বির (আ.)কে (যিনি প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী একজন ওলী) চিনতে পারা তার একটি সুস্পষ্ট কারামত হিসেবে পরিগণিত হয়। (মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা ৫৫০)

Al Arab Tailors

মো. আনোয়ার হোসেন
প্রোপ্রাইটর

আল আরব টেইলার্স
পাঞ্জাবী স্পেশালিস্ট

১১৮, করিম উল্লাহ মার্কেট (নিচ তলা)
বন্দর বাজার, সিলেট

01734-346601

প্রবন্ধ

হাদীসের আলোকে শবে বরাতের ফদীলত ও আমল

মো. আবদুল আউয়াল হেলাল

শবে বরাতের ফদীলত হাদীসের ভাষায় লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান, আমাদের দেশীয় পরিভাষায় শবে বরাত এক মহিমান্বিত রজনী। আবহমানকাল ধরে বাংলাদেশের মুসলমানগণ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এ রাত উদযাপন করে আসছেন। পরিতাপের বিষয় হলো বিগত দেড় দুই দশক থেকে কিছু মানুষ প্রথমে প্রচার করতে থাকে ইসলামে শবে বরাত বলে কিছু নেই। পারসিয়ান অগ্নিপূজারী এবং ভারতীয় হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি থেকে এ দেশের মুসলমানগণ আত্মস্থ করে নিয়েছে শবে বরাত। এসব অপপ্রচারের ফলে সাধারণ মুসলমানের মধ্য যখন মারাত্মক সন্দেহ সংশয় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে তখনই হক্কানী উলামায়ে কিরাম শবে বরাতের ফদীলত বিষয়ক হাদীসসমূহ ব্যাপক প্রচার শুরু করেন। ফলে তাদের বক্তব্যের ধরণও পরিবর্তন হতে শুরু করে। তারা স্বীকার করেন শবে বরাতের ফদীলত গ্রহণযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তবে এ রাতের কোন আমল হাদীস এবং সালফে সালিহীনের কথা বা কাজ দ্বারা প্রমাণিত নয়। মূলতঃ তাদের দু'টি বক্তব্যই ভিত্তিহীন। নিম্নে পবিত্র হাদীসের আলোকে শবে বরাতের ফদীলত ও আমল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

হাদীস-১ (হাদীসে মারফু')

عَنْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يطَّلِعُ اللهُ تبارك وتعالى إلى خَلْقِه ليلةَ النِّصفِ من شعبانَ، فيَغفِرُ لجميعِ خَلْقِه، إلا لمشركٍ أو مُشاحنٍ

-হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন যে, মধ্য শাবানের রাতে (শবে বরাতে) আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি রহমতের নযরে তাকান এবং মুশরিক অথবা অন্যের প্রতি হিংসা পোষণকারী ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন।[১]

হাদীস-২ (হাদীসে মারফু')

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ يطَّلِعُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إلى خَلْقِه ليلةَ النِّصفِ من شعبانَ، فيَغفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا مُشاحنٍ وَقَاتِلِ نَفْسٍ

অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মধ্য শা'বানের রাতে (শবে বরাতে) আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি রহমতের নযরে তাকান। অতঃপর হিংসুক এবং লোক হত্যাকারী ব্যতীত সবাইকে ক্ষমা করে দেন।[২]

হাদীস-৩ (হাদীসে মাওকুফ)

عن ابن عباس رضى الله عنهما أَنَّ اللهَ يَقْضِي الأَقْضِيَةَ فى ليلة النصف من شعبان، ويسلمها إلى أربابها فى ليلة القدر

অর্থাৎ, আবুদদুহা আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন) আল্লাহ তাআলা সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন মধ্য শা'বানের রাতে (শবে বরাতে)। আর দায়িত্বশীল ফিরিশতাগণকে (কার্যকর করার জন্য) বুঝিয়ে দেন শবে কদরে।[৩]

ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আজীবাহ বলেন-

وروى أبو الشيخ، بسند صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنه فى قوله: يَمْحُوا اللهُ ما يَشَاءُ وَيُثْبِتُ قَالَ: ليلة النصف من شعبان، يدبر أمر السنة، فيمحو ما يشاء ويثبت غيره الشقاوة والسعادة، والموت والحياة. قال السيوطي: سنده صحيح لا غبار عليه وسلا مطعن فيه.

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা মুছে দেন আর যা ইচ্ছা টিকিয়ে রাখেন, সূরা রা'দ এর এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আবুশ শাইখ সাহীহ সনদে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন- শা'বানের মধ্য রাতে (শবে বরাতে) আল্লাহ তাআলা দুর্ভাগ্য, সৌভাগ্য, জীবন ও মৃত্যু ইত্যাদি যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা টিকিয়ে রাখেন। ইমাম সুয়ূতী এ বর্ণনার সনদ সম্পর্কে বলেছেন, এই সনদ সাহীহ এতে কোন পঙ্কিলতা নেই, এ বর্ণনার সনদে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি নেই। (আল বাহরুল মাদীদ ফী তাফসীরিল কুরআনিল মাজীদ (তাফসীরে ইবনে আজীবাহ), খ.৫, পৃ.২৭৮)

হাদীস- ৪ (হাদীসে মাকতু')

عن عطاء بن يسار قال: تنسخ فى النصف من شعبان الاجال، حتى ان الرجل ليخرج مسافرا وقد نسخ من الاحياء الى الاموات، ويتزوج وقد نسخ من الاحياء الى الاموات

অর্থাৎ, আতা ইবন ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শবে বরাতে মানুষের আয়ুকে চূড়ান্তভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় (তার

জীবন মৃত্যুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়)। এমনকি একজন মানুষ সফরে বের হয় অথচ তার নাম জীবিতদের তালিকা থেকে মুছে মৃতদের মধ্যে লেখা হয়েছে। একজন মানুষ বিয়ে করে অথচ তার নাম জীবিতদের তালিকা থেকে মুছে মৃতদের মধ্যে লেখা হয়েছে। (ইমাম আবদুর রাযযাক- আল মুসান্নাফ, খ.৫, পৃ.৫৫)

হাদীস- ৫ (মাকতু)

عن عطاء بن يسار قال: مَا مِنْ لَيْلَةٍ بَعْدَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَفْضَلُ مِنْهَا يَعْنِي لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ أَوْ قَاطِعِ رَحِمٍ

অর্থাৎ, আতা ইবন ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শবে কদর এর পর শবে বরাতের চেয়ে বেশি ফদীলতপূর্ণ কোন রাত নেই। সে রাতে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আকাশে আসেন; অতঃপর মুশরিক, অন্যের প্রতি হিংসা পোষণকারী এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন। (ইমাম লালকাঈ - শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলুস সুন্নাহ, খ. ৩, পৃ. ৪৯৯)

হাদীস-৬ (মাকতু)

عن عكرمة قال :في ليلة النصف من شعبان يبرم أمر السنة، وينسخ الأحياء من الأموات، ويكتب الحاج، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أحد

অর্থাৎ, ইকরিমা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শবে বরাতে পুরো বছরের যাবতীয় কাজের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়। জীবিত ও মৃতদের পৃথক তালিকা করা হয়। যারা (পরবর্তী বছর) হজ্জ করবে তাদের তালিকাও প্রস্তুত করা হয়। এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয় না। (তাফসীরে তাবারী, খ. ২১, পৃ. ৯; তাফসীরে বাগাওয়ী, খ. ৪, পৃ. ১৭৩; তাফসীরে ইবন আবি হাতিম, খ. ১৩, পৃ. ৮৯৪; তাফসীরে সা'লাবী, খ. ২৩, পৃ. ৫০৮)

শবে বরাতের ফদীলত সম্পর্কে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ আলিমের অভিমত

হাফিয ইবন তাইমিয়্যা বলেন-

ليلة النصف من شعبان، فقد روى فى فضلها من الأحاديث المرفوعة والاثار ما يقتضى أنها ليلة مفضلة

অর্থাৎ, শবে বরাতের ফদীলত সম্পর্কে অনেক মারফূ' হাদীস এবং আসার (সাহাবী ও তাবিঈগণের অভিমত) বর্ণিত রয়েছে। এগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এটি একটি ফদীলতপূর্ণ রাত। (ইকতিদাউ সিরাতুম মুসতাকীম, পৃ. ৩০১)

ইমাম মুল্লা আলী কারী বলেন-

ليلة النصف من شعبان: وهي ليلة البراءة، ولعل وجه تخصيصها، لأنها ليلة مباركة فيها يفرق كل امر حكيم

অর্থাৎ, শা'বান মাসের মধ্য রাত, সেটি হচ্ছে শবে বরাত। (হাদীসে) সে রাতকে এ কারণে খাস বা বিশেষায়িত করা হতে পারে যে, সে রাতটি হলো বারাকাতপূর্ণ এবং সে রাতেই যাবতীয় প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (মিরকাতুল মাফাতীহ, খ. ৩, পৃ. ৩৮৫)

ইমাম সায়্যিদ আবদুল্লাহ ইবন সিদ্দীক আল গুমারী বলেন-

فضل ليلة النصف من شعبان ثابت فى الجملة وان انكاره على سبيل الاطلاق كما فعل ابن العربي المعافري غلط

অর্থাৎ, শবে বরাতের ফদীলত সর্বাবস্থায় প্রমাণিত। সাধারণভাবে শবে বরাতের ফদীলত অস্বীকার করা, যেরূপ ইবনুল আরাবী আল মুআফিরী করেছেন এটা ভুল। (হুসনুল বায়ান ফী লাইলাতিম মিন নিসফি শা'বান, পৃ. ৩৫)

ইমাম সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইবন আলাওয়ী আল মালিকী আল মাক্কী বলেন-

وفي شهر شعبان ليلة معظمة مباركة مكرمة وهي ليلة النصف منه وقد وردت أحاديث تفيد أنها الليلة التي يتجلى الله فيها على خلقه بعموم مغفرته، وشمول رحمته، فيغفر للمستغفرين، ويرحم المسترحمين، ويجيب دعاء السائلين، ويفرج عن المكروبين، ويعتق فيها جماعة من النار، ويكتب فيها الأرزاق والأعمال.

অর্থাৎ, শা'বান মাসের মধ্যে একটি রাত রয়েছে মর্যাদাবান, বারাকাতপূর্ণ ও সম্মানিত। রাতটি হচ্ছে এ মাসের মধ্যবর্তী রাত (শবে বরাতে)। সে রাতে আল্লাহপাক তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি অসীম মাগফিরাত ও পরিপূর্ণ রাহমাতের নযরে তাকান। অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করে দেন, রাহমাত প্রত্যাশীগণকে রাহমাত দান করেন। আর দুআকারীদের দুআ কবূল করেন। বিপদগ্রস্তদের বিপদ দূরীভূত করেন। আর সে রাতে বিশাল দলকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। এছাড়া সৃষ্টিকুলের রিযক ও আমল সে রাতেই নির্ধারণ করেন। (ইতমিনানিল কুলুব, পৃ. ৬০)

শাইখ আবদুর রাহমান মুবারকপুরী ভারতে জন্মগ্রহণকারী সালাফী- আহলে হাদীস ঘরানার একজন বিখ্যাত আলিম। তিনি তুহফাতুল আহওয়াযি নামে তিরমিযী শরীফের শরাহ প্রণয়ন করেছেন। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত শবে বরাতের ফদীলত বিষয়ক একটি হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি এ বিষয়ে আরো কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন-

فهذه الاحاديث بمجموعها حجة على من زعم انه لم يثبت فى فضيلة ليلة النصف من شعبان شئ

অর্থাৎ, এই সামষ্টিক হাদীস তাদের বিরুদ্ধে হুজ্জাত বা দলীল যারা বলতে চান যে, শবে বরাতের ফদীলত প্রমাণের জন্য কোন কিছু নেই। (তুহফাতুল আহওয়াযি শারহু জামিউত তিরমিযী, খ.৩, পৃ.৩৬৭)

যারা এক সময় শবে বরাতের ফদীলত সম্পর্কে বর্ণিত সব হাদীসকে বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বলতেন বিগত কয়েক বছর থেকে তারা সুর পালটে বলতে শুরু করেছেন, কিছু হাদীস দ্বারা শবে বরাতের ফদীলতের প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এ রাতে বিশেষ কোন আমল প্রমাণিত নয়। এ রাতে জেগে থাকা এবং অতিরিক্ত ইবাদাত বন্দেগী করা এসবের কোন ভিত্তি শরীআতে নেই। আমরা নিম্নে কিছু হাদীস ও পূর্ববর্তী যুগের কতিপয় ইমামের অভিমত পেশ করছি। এর দ্বারা শবে বরাতের নির্দিষ্ট কিছু আমল প্রমাণিত হয়।

হাদীস-১ (মারফূ')

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَادَى مُنَادٍ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ، فَلَا يَسْأَلُ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا أُعْطِيَ، إِلَّا زَانِيَةً بِفَرْجِهَا أَوْ مُشْرِكًا.

অর্থাৎ, হযরত উসমান ইবন আবুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন যে, মধ্য শা'বানের রাত (শবে বরাত) এলে একজন ঘোষক (আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে) ঘোষণা করেন, কে আছো ক্ষমা প্রার্থনাকারী- আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। কে আছো কোন কিছু প্রার্থনাকারী- আমি তাকে তার প্রার্থিত জিনিস প্রদান করবো। (সে রাতে) মুশরিক এবং যিনাকারী ব্যতীত আল্লাহর কাছে যে যা কিছু চায় তিনি তাকে তা দেন।[8]

হাদীস-২ (মারফূ')

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَخَرَجْتُ، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ لِي: أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟، قَالَتْ: قُلْتُ: ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ.

অর্থাৎ, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে খুঁজে না

পেয়ে তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। তখন তিনি জান্নাতুল বাকীতে আকাশের দিকে মাথা মুবারক উত্তোলিত অবস্থায় ছিলেন (বাকীতে দাফনকৃতদের জন্য দুআ করছিলেন)। তিনি বললেন, হে আয়িশা! তুমি কি আশঙ্কা করো আল্লাহ ও রাসূল তোমার সাথে অবিচার করবেন? তিনি বলেন, আমি বললাম ঠিক এমনটি নয়; বরং আমি ভেবেছিলাম হয়তো আপনি আপনার অন্য কোন পত্নীর ঘরে গিয়েছেন। তিনি বললেন, মধ্য শাবানের রাতে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। অতঃপর বনু কালব গোত্রের বকরীর পশমের চেয়েও বেশি সংখ্যক মানুষকে ক্ষমা করে দেন।[৫]

হাদীস-৩ (মারফু')

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

অর্থাৎ, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মধ্য শা'বান এলে তোমরা (নফল ইবাদতের জন্য) রাত জেগে থেকো, আর দিনে রোযা রেখো। কেননা সেদিন সূর্যাস্তের পর থেকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আকাশে এসে ঘোষণা করতে থাকেন, কে আছো ক্ষমা প্রার্থনাকারী, আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। কে আছো রিযক প্রার্থী, আমি তাকে রিযিক প্রদান করবো। কে আছো বিপদগ্রস্ত, আমি তাকে পরিত্রাণ দেবো। ফজর পর্যন্ত এরকম ঘোষণা চলতে থাকে।[৬]

হাদীস-৪ (মাওকুফ)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ.

অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন পাঁচটি রাত রয়েছে যেগুলোতে দুআ ফেরত দেওয়া হয় না। রাতগুলো হলো- জুমুআর রাত, রজব মাসের প্রথম রাত, শা'বান মাসের মধ্যবর্তী রাত (শবে বরাত) এবং দুই ঈদের রাত।[৭]

প্রমাণিত আমল

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত উল্লিখিত মাওকুফ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় শবে বরাতে দুআ কবূল হয়। সুতরাং এ রাতে বেশি বেশি দুআ করা বাঞ্চনীয়।

হাদীস-৫ (মাকতু')

وَرَوَى الْخَلَّالُ فِي كِتَابِ فَضْلِ رَجَبٍ لَهُ مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ؛ قَالَ: خَمْسُ لَيَالٍ فِي السَّنَةِ مَنْ وَاظَبَ عَلَيْهِنَّ رَجَاءَ ثَوَابِهِنَّ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِنَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ: أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ يَقُومُ لَيْلَهَا وَيَصُومُ نَهَارَهَا، وَلَيْلَةُ الْفِطْرِ، وَلَيْلَةُ الْأَضْحَى، وَلَيْلَةُ عَاشُورَاءَ، وَلَيْلَةُ نِصْفِ شَعْبَانَ.

অর্থাৎ, হযরত খাল্লাল স্বীয় ফাদলে রাজাব নামক কিতাবে খালিদ ইবন মা'দান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, বছরের মধ্যে এমন পাঁচটি রাত রয়েছে যদি কোন ব্যক্তি সাওয়াবের আশা এবং শাস্তির ভীতি অন্তরে নিয়ে সে রাতগুলো গুরুত্বের সাথে কাটায় তবে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সে রাতগুলো হলো, রজব মাসের প্রথম রাত, (নফল ইবাদাতের জন্য) সে রাত জেগে থাকবে এবং পরের দিন রোযা রাখবে। ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আদহার রাত, আশুরার রাত এবং শা'বানের মধ্যবর্তী রাত (শবে বরাত)।[৮]

শবে বরাতের আমল সম্পর্কে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ আলিমের অভিমত

ইমাম শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

إن الدعاء يُستجاب في خمس ليال: في ليلة الجمعة، وليلة الأضحى، وليلة الفطر، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان

অর্থাৎ, পাঁচ রাতে দুআ কবুল হয়। রাতগুলো হলো জুমুআর রাত, ঈদুল আদহা ও ঈদুল ফিতর এর রাত, রজব মাসের প্রথম রাত এবং শা'বান মাসের মধবর্তী রাত (শবে বরাত)। (আসসুনানুল কুবরা, খ.৩, পৃ.৪৪৫, শুআবুল ঈমান, খ.৩, পৃ.৩৪২, তালখীসুল হাবীর, খ.৩, পৃ.৭৩, আল বাদরুল মুনীর, খ.৫, পৃ.৪০)

ইমাম শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহর উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় শবে বরাতে বেশি দুআ করতে হবে।

হাফিয ইবন তাইমিয়্যা (ওফাত: ৭২৮ হি.)

وأما ليلة النصف فقد روى في فضلها أحاديث وآثار، ونقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يصلون فيها، فصلاة الرجل فيها وحده قد تقدمه فيه سلف وله فيه حجة فلا ينكر مثل هذا

অর্থাৎ, শবে বরাত বিষয়ে কথা হলো এ রাতের ফদীলত বিষয়ে অনেক হাদীস এবং আসার বর্ণিত রয়েছে। সলফে সালিহীন থেকে উদ্ধৃত রয়েছে যে, তাঁরা এ রাতে নফল নামায আদায় করতেন। এ রাতে নফল নামায একা একা পড়তে হবে। সলফে সালিহীন এরকমই করতেন। এটাই (পরবর্তীদের জন্য) হুজ্জাত বা গ্রহণযোগ্য দলীল। সুতরাং এটাকে অস্বীকার করা যাবে না। (মাজমুআয়ে ফাতাওয়া, খ.২৩, পৃ.১৩২)

হাফিয ইবন তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ'র ভাষ্যমতে সালফে সালিহীন শবে বরাতে নফল নামায পড়তেন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন সালফে সালিহীন'র এই আমলই পরবর্তীদের জন্য হুজ্জাত বা দলীল। সুতরাং তাঁর এ ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শবে বরাত হলো বেশি বেশি নফল নামায আদায়ের রাত।

ইমাম মুল্লা আলী কারী হানাফী (ওফাত: ১০১৪ হি.) বলেন-

ففى الحديث دلالة على استحباب زيارة القبور في ليلة النصف من شعبان والاستغفار للاقارب والاخوان وعموم اهل الايمان

অর্থাৎ, হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, শবে বরাতে কবর যিয়ারত করা, নিজের ঘনিষ্ঠজন এবং সাধারণ মুমিনদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করা মুস্তাহাব। (আততিবইয়ান (মাখতুত), পৃ.১২)

ইমাম আবূ শামাহ শাফিঈ বলেন-

وأما ليلة النصف من شعبان فلها فضيلة وإحياؤها بالعبادة مستحب ولكن على الانفراد من غير جماعة

অর্থাৎ, শবে বরাত হচ্ছে একটি ফদীলতপূর্ণ রাত। এ রাতে জামাআত ছাড়া একা একা নফল নামাযের জন্য জাগ্রত থাকা মুস্তাহাব। (আল বাঈসু আলা ইনকারিল বিদঈ ওয়াল হাওয়াদিস, পৃ.৪৪)

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী শাফিঈ বলেন-

واما ليلة النصف من شعبان فلها فضل، واحياؤها بالعبادة مستحب

অর্থাৎ, মধ্য শা'বানের রাতের (শবে বরাতের) ফদীলত রয়েছে। এ রাতে ইবাদাতের জন্য জেগে থাকা মুস্তাহাব। (হাকীকাতুস সুন্নাহ ওয়াল বিদআত, পৃ. ১৩৫)

ইমাম ইবন রাজাব হাম্বলী (ওফাত: ৭৯৫ হি.) শবে বরাতের করণীয় সম্পর্কে বলেন-

فينبغي للمؤمن أن يتفرغ في تلك الليلة لذكر الله تعالى ودعائه بغفران الذنوب، وستر العيوب، وتفريج الكروب، وأن يقدم على ذلك التوبة فإن الله تعالى يتوب فيها على من يتوب

অর্থাৎ, একজন মুমিনের উচিত এ রাতে (শবে বরাতে) যেন আল্লাহ তাআলার যিকর করে। এছাড়া গুনাহসমূহ ক্ষমা করা, ত্রুটিসমূহ ঢেকে

রাখা এবং বিপদসমূহ দূর করার জন্য যেন দুআ করে। এ রাতের প্রথম কাজ হলো তাওবা করে নেয়া। কেননা এ রাতে যারা তাওবা করে আল্লাহ তাআলা তাদের তাওবা কবুল করেন। (লাতাইফুল মা'রিফ, পৃ.১৯৬)

ইমাম আবদুল হাই লখনভী হানাফী বলেন-

...لا كلام فى استحباب إحياء ليلة البراءة بما شاء من العبادات وبأداء التطوعات فيها فيعلم بمجموع الأحاديث القولية والفعلية استحباب إكثار العبادة فيها

অর্থাৎ, শবে বরাতে নফল ইবাদাত বন্দেগী করার জন্য রাত্রি জাগরণ করা যে মুস্তাহাব এতে কোন কথাই নেই। জেনে রাখুন কাওলী (কথাবাচক) ও ফি'লি (কর্মবাচক) হাদীসসমূহ দ্বারা এ রাতে বেশি করে নফল ইবাদাত করা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়। (আল আসারুল মারফুআহ, পৃ.৮১)

পরিশেষে বলতে চাই, বিগত তিন চার বছর আগেও যারা ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ায় ফলাও করে প্রচার করতেন ইসলামী শরীআতে শবে বরাত বলতে কিছু নেই। এটি পারস্যের অগ্নি পূজারী এবং ভারতীয় পৌত্তলিকদের কাছ থেকে আমদানি করা সংস্কৃতি। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তারা সুর পালটাতে বাধ্য হয়েছেন। এই ক'বছর থেকে তারাই বলতে শুরু করেছেন, কিছু গ্রহণযোগ্য হাদীস দ্বারা শবে বরাতের ফযীলত প্রমাণিত হয়। তবে এ রাতে নির্দিষ্ট আমলের কোন প্রমাণ নেই। আশা করা যায় উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তাদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হবে। সেই সাথে স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাবে শবে বরাত কেন্দ্রীক প্রচলিত কতিপয় অনৈসলামিক কার্যাদি যেমন আতশবাজি-পটকা ফোটানো, পাড়ায় মহল্লায় আনন্দ উল্লাস করা, কবরস্থান এবং বসতঘরে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ইত্যাদি পরিহার করে হাদীসের আলোকে সালফে সালিহীন নির্দেশিত পন্থায় মহিমান্বিত রজনী শবে বরাত উদযাপনে সর্বস্তরের মুসলমান মনযোগী হবেন।

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

অর্থাৎ, সত্য সমাগত মিথ্যা অপস্রিত। নিশ্চয়ই মিথ্যার লয় অবশ্যম্ভাবি। (ঈষৎ সংক্ষেপিত)

---

১. ইমাম ইবন হিব্বান- সাহীহ ইবন হিব্বান (অখণ্ড), পৃষ্ঠা ১৫১৪; ইমাম বাইহাকী- ফাদাইলুল আওকাত, পৃষ্ঠা ১৮; ইমাম তাবারানী- আল মু'জামুল কাবীর, খ.২০, পৃ. ১০৭; ইমাম তাহারানী- আল মু'জামুল আওসাত, খ.৭, পৃ. ৩৬; ইমাম মুনযিরী- আত তারগীব ওয়াত তারহীব (অখণ্ড), পৃ.২৪১; ইমাম দিমইয়াতী- আল মাতজারুর রাবিহ, পৃ.১৮২; ইমাম আবূ আসিম- আসসুন্নাহ, পৃ.৮০; ইমাম আবূ নাঈম ইস্পাহানী- হিলইয়াতুল আউলিয়া, খ.৫, পৃ.১৯১; ইমাম ইবন আসাকির- তারীখু দিমাশক, খ.৩৮, পৃ.২৩৫; ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী- আদদুররুল মানসূর, খ.৫, পৃ.৭৪১; ইমাম মোল্লা আলী কারী- আততিবইয়ান, পৃ.১০; ইমাম হাইসামী- মাজমাউয যাওয়াঈদ, খ.৮, পৃ.৬৫; ইমাম ইবনু রাজাব হাম্বালী- লাতাইফুল মা'রিফ, পৃ.১৮৮; ইমাম ইবন দুবাইসী- লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান ওয়া ফাদলুহা, পৃ.৪৩; ইমাম সায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন আলাওয়ী আল মালিকী আল মাক্কী- ইতমিনানিল কুলূব (মাযা ফী শা'বান), পৃ.৬১; ইমাম সায়্যিদ যাকী ইবরাহীম- লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান, পৃ.৭; ইমাম সায়্যিদ সালিম সানহুরী- ফাদাইলু লাইলাতিন নিসফি শাহরি শা'বান, পৃ.৪; ইমাম আবদুল হক দেহলভী- মা ছাবাতা বিসসুন্নাহ, পৃ.২০; ইমাম সায়্যিদ আবদুল্লাহ বিন সিদ্দীক আলগুমারী- হুসনুল বায়ান ফী লাইলাতিন মিন নিসফি শা'বান, পৃ.২১; শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী- সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ, খ.৩, পৃ. ১৩৫; শাইখ ড. আলী মুহাম্মাদ ইউসুফ আল মুহাম্মাদী- লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান ফী দাউয়িস সুন্নাতিল মুশাররাফাহ, পৃ. ২২১; শাইখ জামাল বিন উমার আল মাক্কী- রিসালাতু লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান, পৃ.৮; শাইখ ড. সায়্যিদ মাহমুদ আসসাবীহ- লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান, পৃ. ৭২; শাইখ আবদুল হাফিয মালিক আবদুল হক মাক্কী- ফাদাইলু লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান, পৃ.৮; শাইখ আবূ উবাইদা মাশহুর বিন হাসান- হুসনুল বায়ান, পৃ. ১৭।

২. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল- আল মুসনাদ, খ. ২, পৃ. ১৭৬; ইমাম মুনযিরী- আততারগীব ওয়াত তারহীব, খ. ৩, পৃ. ৩০৪; ইমাম হাইসামী- মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ. ৮, পৃ. ৬৫; ইমাম ইবন দুবাইসী- লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান ওয়া ফাদলিহা, পৃ. ৮১; ইমাম দিমইয়াতি- আল মাতজারুর রাবিহ, পৃ. ১৮৬; ইমাম ইবন রাজাব হাম্বলী- লাতাইফুল মা'রিফ, পৃ. ১৮৯; ইমাম ইবন হাজার মাক্কী- আল ইদাহ ওয়াল বায়ান, পৃ. ৭; ইমাম সায়্যিদ আবদুল্লাহ বিন সিদ্দীক আলগুমারী, হুসনুল বায়ান ফী লাইলাতিন মিন নিসফি শা'বান, পৃ. ১২; ইমাম সায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন আলাওয়ী আল মালিকী আল মাক্কী- ইতমিনানুল কুলুব (মা যা ফী শা'বান), পৃ. ৬২; শাইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী- সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ, খ. ৩, পৃ. ১৩৬; শাইখ আবূ উবাইদা মাশহুর বিন হাসান- হুসনুল বায়ান, পৃ. ২৫।

৩. ইমাম আবূ হাফস নাসাফী- আততাইসীর ফিত তাফসীর (তাফসীরে নাসাফী), খ. ১৩, পৃ. ৩১৭; ইমাম বুরহানুদ্দীন আল বুকাঈ- নাযমুদ্দুরার ফী তানাসুবিল আয়াতি ওয়াস সুওয়ার, খ. ১৮, পৃ. ৬; ইমাম শিহাবুদ্দীন আলুসী- রূহুল মা'নী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীমি ওয়া সাবয়িল মাসানী, খ. ১৩, পৃ. ১১২; ইমাম আবূ মুহাম্মাদ হুসাইন ইবন মাসউদ আল বাগাওয়ী- মা'লিমুত তানযীল (তাফসীরে বাগাওয়ী), খ. ৭, পৃ. ২২৮; ইমাম আবূ ইসহাক আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ সা'লাবী- আল কাশফ ওয়াল বায়ান আন তাফসীরিল কুরআন (তাফসীরে সা'লাবী), খ. ৩০, পৃ. ৫৯; ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আজীবাহ- আল বাহরুল মাদীদ ফী তাফসীরিল কুরআনিল মাজিদ (তাফসীরে ইবন আজীবাহ), খ. ৫, পৃ. ২৭৮; ইমাম আবদুল কাদির ইবন মুল্লা হুওয়াইশ- বায়ানুল মা'নী, খ. ৪, পৃ. ৯৩; আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী- তাফসীরে মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ৩১১।

৪. ইমাম বাইহাকী- শুআবুল ঈমান, খ.৩, পৃ.৩৮৩, ফদাইলুল আওকাত, পৃ.১৯; ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী- জামিউল কাবীর, খ.১, পৃ.৪৯৭, আদদুররুল মানসূর, খ.৫, পৃ.৭৪২; ইমাম মুহাম্মাদ ইবন জাফর আল খারাইতি- মাসাওয়িল আখলাক, খ.১, পৃ.৪৬; ইমাম মুল্লা আলী কারী- আততিবইয়ান (মাখতুত), পৃ.১০; ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সাঈদ ইবনুদ দুবাইসী- লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান ওয়া ফাদলুহা, পৃ.৬৬; ইমাম সালিম সানহুরী- আল কাশফ ওয়াল বায়ান আন ফাদাইলি লাইলাতিন নিসফি মিন শা'বান,পৃ.১৬; ইমাম সায়্যিদ আবদুল্লাহ ইবন সিদ্দীক আল গুমারী- হুসনুল বায়ান ফী লাইলাতিন নিসফি মিন শা'বান, পৃ.১৩; শাইখ ড. সায়্যিদ মাহমুদ আসসাবীহ- লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান, পৃ.৮০।

৫. ইমাম তিরমিযী- সুনান তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ২০৭; ইমাম ইবন মাজাহ- সুনান ইবন মাজাহ, পৃ.২০২; ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল- আল মুসনাদ, খ.৬, পৃ.২৩৮; ইমাম ইবন আবী শাইবাহ- আল মুসান্নাফ, খ.৬, পৃ.১০৮; ইমাম বাইহাকী- শুআবুল ঈমান, খ.৭, পৃ.৪০৭; ইমাম তাবারানী- আদদুআ, খ. ১, পৃ. ১৯৪-১৯৫; ইমাম দারাকুতনী- আননুযূল, খ.১, পৃ.৯৩; ইমাম খাতীব তিবরিযী- মিশকাতুল মাসাবীহ, খ.১, পৃ.৪০৬; ইমাম বাগাওয়ী- শারহুস সুন্নাহ, খ.৪, পৃ.১২৬; ইমাম ইবনুল আসীর- জামিউল উসূল, খ.৯, পৃ.২৬৪; ইমাম ইবনুদ দুবাইসী- লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান ওয়া ফাদলুহা, পৃ.৫৪।

৬. ইমাম ইবন মাজাহ- আস সুনান (ইবন মাজাহ শরীফ), পৃ. ২০২, হাদীস-১৪৫১; ইমাম বাইহাকী- শুআবুল ঈমান, খ. ৭, পৃ. ৪০৭, ফাদাইলুল আওকাত, পৃ. ১৯; ইমাম সুয়ূতী- আদদুররুল মানসূর, খ.৫, পৃ. ৭৪১, জামিউস সাগীর, পৃ. ৬৬৫; ইমাম মুনযিরী- আততারগীব ওয়াততারহীব, খ.৩, পৃ. ১৭৫; ইমাম আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক আল ফাকিহী- আখবারু মাক্কা ফী কাদিমিদদাহরি ওয়া হাদীসিহি, খ.৩, পৃ. ৮৪; ইমাম আলী মুত্তাকী- কানযুল উম্মাল, খ.১২, পৃ. ৩১৪; ইমাম ইবনুদ দুবাইসী- লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান ওয়া ফাদলুহা, পৃ. ৩৭; ইমাম ইবন রাজাব হাম্বলী, লাতাইফুল মা'রিফ, পৃ. ১৮৯; ইমাম ইবনু হাজার মাক্কী- আল ইদাহ ওয়াল বায়ান, পৃ. ১০।

৭. ইমাম আবদুর রাযযাক- আল মুসান্নাফ, খ. ৪, পৃ. ৩১৭; ইমাম বাইহাকী- শুআবুল ঈমান, খ. ৫, পৃ. ২৮৮, ফাদাইলুল আওকাত, পৃ. ৩১১; ইমাম সুয়ূতী- আল জামিউস সাগীর, পৃ. ৫৯৬; ইমাম ইবন মুলাক্কিন- আল বাদরুল মুনীর, খ. ৫, পৃ. ৪০।

৮. ইমাম ইবন হাজার আসকালানী- তালখীসুল হাবীর, খ. ২, পৃ. ১৬১; ইমাম আবদুল কাদির জিলানী- আল গুনিয়াতু লিতালিবিল হাক্ক, খ. ১, পৃ. ৩২৭; ইমাম ইবন মুলাক্কিন- আল বাদরুল মুনীর, খ. ৫, পৃ. ৪০; ইমাম ইবন রাজাব হাম্বলী- লাতাইফুল মা'রিফ. পৃ. ১৩২।

প্রাণীর মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণ ইসলাম বনাম প্রগতিশীলতা

মারজান আহমদ চৌধুরী

> “
>
> ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে, যে আমার সৃষ্টির সদৃশ কিছু সৃষ্টি করতে চায়। সামর্থ থাকলে তারা সৃষ্টি করুক একটি বীজ বা একটি অণু। (সহীহ বুখারী)
>
> ”

বাংলাদেশসহ প্রায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশেই সম্মানার্থে বা স্মরণার্থে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ভাস্কর্য নির্মাণ করার প্রবণতা রয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে এসব ভাস্কর্য বা প্রতিকৃতির সামনে ফুলেল শ্রদ্ধা প্রদর্শন, নীরবতা পালন, আবার কখনো মুনাজাত করতে দেখা যায়। আবার সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য অন্যান্য প্রাণীর ভাস্কর্য ইতিউতি চোখে পড়ে। যদিও প্রচলিত সেক্যুলার কালচারে এ বিষয়টি নন্দনতত্ত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য প্রতীকে পরিণত হয়েছে, কিন্তু ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ বা অন্য যে কোনো প্রাণীর ভাস্কর্য বা প্রতিকৃতি নির্মাণ করা হারাম। এ প্রবন্ধে বিষয়টি নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলাপ করব।

পবিত্র কুরআনে নূহ (আ.)-এর সময়কার মুশরিকদের একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে এভাবে-

وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًاۚ

-এবং তারা বলেছিল, তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করো না এবং ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসরকেও পরিত্যাগ করো না। (সূরা নূহ, আয়াত-২৩)

উক্ত আয়াতের তাফসীরে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে। হাদীসের শেষাংশ এরূপ-

أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ

-(আয়াতে উল্লিখিত নামগুলো) নূহ (আ.)-এর সময়কার কতিপয় পুণ্যবান লোকের নাম ছিল। তারা মারা যাওয়ার পর শয়তান তাদের গোত্রের লোকদের মনে এ কথা ঢেলে দিল যে, তারা যেখানে বসে মজলিস করত, সেখানে তোমরা প্রতিকৃতি নির্মাণ করো এবং ওই পুণ্যবান লোকদের নামে এগুলোর নামকরণ করো। তারা তা-ই করল। কিন্তু তখনও ওসব মূর্তির পূজা করা হতো না। মূর্তি স্থাপনকারী লোকেরা মারা যাওয়ার পর যখন মূর্তিগুলোর ব্যাপারে সত্যিকারের জ্ঞান বিলুপ্ত হলো, তখন লোকজন তাদের পূজা আরম্ভ করে দিলো। (সহীহ বুখারী)

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায়, নবী নূহ (আ.) এর সময়কার কতিপয় পুণ্যবান ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর লোকেরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তাদের প্রতিমা তৈরি করেছিল। ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়; বরং প্রতীক বা স্মরণিকা হিসেবে। কালের বিবর্তনে সেই শ্রদ্ধা এক সময় চরম ভক্তিতে রূপ নিয়েছিল এবং পরবর্তী লোকেরা সেগুলোর পূজা করতে শুরু করেছিল।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

-অতএব তোমরা মূর্তিসমূহের নোংরামি পরিহার করো এবং পরিহার করো মিথ্যা কথাবার্তা। (সূরা হাজ্জ, আয়াত-৩০)

ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ। ইসলাম এই জায়গায় বিন্দুমাত্র আপোস করতে পারে না। ইসলামে আল্লাহ ছাড়া বা আল্লাহর সাথে মিলিয়ে অন্য কারও ইবাদত করা যায় না। এই তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য সায়্যিদুল মুরসালীন ﷺ দিনের আলোতে ঘাম ঝরিয়েছেন, রাতের আঁধারে ফেলেছেন চোখের পানি। এই তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর নবী ﷺ এর দেহ মুবারক জখম হয়েছে, শরীর থেকে রক্ত ঝরেছে। সাহাবায়ে কিরাম এই তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য অকাতরে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। ইসলামে সবচেয়ে সংবেদনশীল (Sensitive) বিষয় হচ্ছে তাওহীদ। শিরক করা তো বহু দূরের কথা; যে কাজের মধ্যে শিরকের নাপাক গন্ধ পাওয়া যায়, ইসলাম সেই কাজের আশেপাশেও পা মাড়াতে নিষেধ করেছে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাওহীদের সংরক্ষণার্থে মাত্রাতিরিক্ত সতর্ক ছিলেন। আবূ ওয়াকিদ আল লাইসী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى : "اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

-যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খাইবারের যুদ্ধে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি একটি বৃক্ষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। মুশরিকরা ওই বৃক্ষকে 'যাতু আনওয়াত্ব' নামে ডাকত, যেখানে তারা তাদের যুদ্ধাস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। কতিপয় সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যেভাবে ওদের 'যাতু আনওয়াত্ব' রয়েছে, এভাবে আমাদের জন্যও একটি 'যাতু আনওয়াত্ব' নির্ধারণ করে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন, সুবাহানাল্লাহ! তোমাদের এ কথাটি এরকম, যেভাবে মূসা (আ.) এর কউম তাঁকে বলেছিল, আমাদের জন্য একটি উপাস্য (দেবতা) বানিয়ে দিন, যেভাবে ওদের (কাফিরদের) দেবতা রয়েছে। কসম সেই আল্লাহর, যার হাতে আমার প্রাণ। তোমরাও (এক সময়) তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের পথ অনুসরণ করবে। (তিরমিযী)

লক্ষণীয় বিষয় হলো, সাহাবীরা কিন্তু ওই বৃক্ষকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করতে চাননি, চাওয়ার প্রশ্নই আসে না। সাহাবীরা ঈমানের ব্যাপারে ইস্পাত-দৃঢ় ছিলেন। তাঁরা কেবল এটি প্রতীক বা স্মরণিকা হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল ﷺ এতটুকু কথার উপর এতো বেশি অসন্তুষ্ট হয়েছেন যে, তিনি বনী ইসরাইলের একটি স্পষ্ট শিরকের সাথে সাহাবীদের দাবিকে তুলনা করেছেন। যেখানেই শিরকের সামান্য সম্ভাবনা ছিল, রাসূল ﷺ সেখানে শিশাঢালা প্রাচীরের মতো প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

বলার উদ্দেশ্য হলো, তথাকথিত কিছু স্কলার বলতে চান, মূর্তি ও ভাস্কর্য আলাদা জিনিস। আমরা তাদের কথা মেনে নিচ্ছি। আসলেই এ দুটি আলাদা জিনিস। উপাসনার উদ্দেশ্যে মূর্তি তৈরি করা শিরক, আর উপাসনার উদ্দেশ্য ছাড়া (মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর) ছবি, প্রতিমা বা প্রতিকৃতি তৈরি করা হারাম। আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মু হাবীবা ও উম্মু সালামাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে উল্লেখ করলেন যে, তাঁরা হাবাশায় একটি গির্জা দেখেছেন, যেখানে কিছু প্রতিকৃতি ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাদের মধ্যে যখন কোনো পুণ্যবান লোক মারা যেত তখন তারা তাদের কবরের উপর উপাসনার জায়গা নির্মাণ করত এবং এসব প্রতিকৃতি তৈরি করে রাখত। এরা কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে জগতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসেবে গন্য হবে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবন হাজার আসকালানী বলেছেন, এই হাদীসের মধ্যে যাবতীয় প্রাণীর প্রতিকৃতি (আঁকা বা নির্মাণ করা) হারাম সাব্যস্ত হওয়ার দলীল রয়েছে। (ফাতহুল বারী, ১/৫২৫)। ইমাম নববী বলেছেন, যাবতীয় প্রাণীর ছবি/প্রতিকৃতি (আঁকা বা নির্মাণ করা) স্পষ্টত হারাম কাজ এবং কবিরাহ গুনাহ। তবে ছবি/প্রতিকৃতি যদি প্রাণীর না হয়, তাহলে তা হারাম নয়। (শারহু সহীহ মুসলিম, ১৪/৮১)

আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً

-ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে, যে আমার সৃষ্টির সদৃশ কিছু সৃষ্টি করতে চায়। সামর্থ থাকলে তারা সৃষ্টি করুক একটি বীজ বা একটি অণু। (সহীহ বুখারী)

আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

-যারা চিত্র/ভাস্কর্য তৈরি করে, তারা কিয়ামতের দিন শাস্তি পাবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যেগুলোকে সৃষ্টি করেছিলে, ওগুলোতে প্রাণ দাও। (সহীহ বুখারী)

আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

-কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শাস্তিপ্রাপ্ত হবে চিত্রকর/ভাস্কর। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

উল্লেখিত হাদীসসমূহ প্রাণীর চিত্র অঙ্কন করা এবং প্রতিকৃতি নির্মাণ করাকে স্পষ্টভাবে হারাম এবং কবিরাহ গুনাহর কাজ হিসেবে প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। তবে চিত্র বা প্রতিকৃতি যদি মানুষ বা কোনো প্রাণীর না হয়, তবে তা আঁকা ও নির্মাণ করা হারাম নয়। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) এক চিত্রকরকে বলেছিলেন,

وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ

-আফসোস! যদি তোমাকে (জীবিকা অর্জনের জন্য) চিত্র/প্রতিকৃতি তৈরি করতেই হয়, তাহলে গাছপালা বা এরকম কিছু তৈরি করো যার মধ্যে রূহ নেই। (সহীহ বুখারী)

ইসলামে প্রাণীর চিত্র, মূর্তি, প্রতিমা, প্রতিকৃতি বা ভাস্কর্য (যে নামেই ডাকা হোক না কেন) এ জন্য হারাম করা হয়েছে যে, এসব প্রতিকৃতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার জায়গা থেকেই তৈরি করা হয়। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বাড়তে বাড়তে এক সময় তা ভক্তিতে রূপ নেয়, মানুষজন এসব প্রতিকৃতিকে কুর্নিশ করতে শুরু করে। ধীরে ধীরে উদ্দেশ্যহীন কুর্নিশ উদ্দেশ্যযুক্ত উপাসনায় রূপ নেয়। এতে করে একদিকে যেমন আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে শিরক করা হয়, অপরদিকে স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহর অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যে অনধিকারচর্চা করা হয়।

যেসব তথাকথিত প্রগতিশীল ইসলামিক স্কলার ভাস্কর্য বা প্রতিকৃতির পক্ষে রায় দেন, তাদের দাবি হচ্ছে, মূর্তি নির্মাণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ হলেও পূজার উদ্দেশ্য ব্যতীত প্রতিকৃতি বা ভাস্কর্য নির্মাণ করা হারাম নয়।

তাঁদের প্রথম যুক্তি হচ্ছে, আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) পুতুল দিয়ে খেলেছেন। রাসূল ﷺ তাঁকে এমনটি করতে বারণ করেননি। এর মাধ্যমে বুঝা যায় যে, পুতুল বা প্রতিকৃতি ব্যবহার করা জায়েয। দ্বিতীয় যুক্তি হচ্ছে, নবী সুলাইমান (আ.)-এর জন্য জিনেরা প্রতিকৃতি তৈরি করেছিল। সুতরাং প্রতিকৃতি নির্মাণ করা জায়িয। তৃতীয় যুক্তি হচ্ছে, বিভিন্ন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে ভাস্কর্য বা প্রতিকৃতি নির্মিত আছে। সুতরাং ভাস্কর্য বা প্রতিকৃতি নির্মাণ করা জায়িয।

প্রথমত, একথা ঠিক যে, আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) বাল্যবয়সে পুতুল দিয়ে খেলেছেন। তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন,

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي

-আমি নবী ﷺ এর ঘরে পুতুল দিয়ে খেলতাম। আমার বান্ধবীরাও আমার সাথে খেলত। (সহীহ বুখারী)

তবে তাঁর পুতুল খেলার উপর কিয়াস করে সাহাবী বা পরবর্তী কোনো ইমাম-আইম্মা প্রাণীর চিত্র অংকন এবং প্রতিকৃতি বা ভাস্কর্য নির্মাণকে বৈধতা দেননি। কারণ এগুলো হারাম হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল বিদ্যমান। সিরিয়ার দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীআহ বিভাগের অধ্যাপক ড. হিন্দ আল-খাওলী ভাস্কর্য ও প্রতিকৃতি নির্মাণ সংক্রান্ত মতামত পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, প্রণিধানযোগ্য মত হচ্ছে সেটি, যার সমর্থনে স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। তা হলো, রূহবিশিষ্ট প্রাণীর প্রতিকৃতি নির্মাণ করা, চাই তা দৈহিক অবয়ববিশিষ্ট হোক (ভাস্কর্য) অথবা দৈহিক অবয়বহীন (চিত্র), চাই সেটি পাথরের তৈরি হোক, কাঠের তৈরি হোক, মাটির তৈরি হোক কিংবা অন্য কিছু দিয়ে তৈরি হোক, সর্বাবস্থায় এটি হারাম। ইমাম আসকালানী, ইমাম নববী, ইমাম কুরতুবী, ইমাম খাত্তাবী ও ইমাম ইবনুল আবিদীন প্রমুখের মতে, হানাফী, মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী চার মাযহাবের ঐক্যমতের ভিত্তিতে এটিকে হারাম করা হয়েছে। কারণ এটি হারাম হওয়ার পক্ষে রাসূল ﷺ স্পষ্ট হাদীস বিদ্যমান।

আয়িশা (রা.)-এর পুতুল খেলার ব্যাখ্যায় উলামায়ে কিরামের দুটি মতামত বিদ্যমান। প্রথম মতটি হলো, এই হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শিশুকন্যাদের খেলার জন্য পুতুল রাখা জায়িয। এটি চিত্র/ভাস্কর্য হারাম হওয়ার সাধারণ হুকুমের মধ্য থেকে বিশেষভাবে আলাদা করা হয়েছে।

অর্থাৎ, প্রাণীর চিত্র, প্রতিকৃতি ইত্যাদি তৈরি ও সংরক্ষণ করা সাধারণভাবে হারাম। তবে শিশুদের খেলার জন্য তা ব্যবহার করা জায়িয। দ্বিতীয় মতটি হলো, আয়িশা (রা.)-এর জন্য পুতুল খেলার সুযোগ ছিল হারাম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

অর্থাৎ, তিনি যখন পুতুল খেলেছিলেন, তখন পর্যন্ত এটি হারাম ছিল না। বেশিরভাগ উলামায়ে কিরাম প্রথমোক্ত মতটি সমর্থন করেছেন। অর্থাৎ, শিশুদের জন্য পুতুল খেলা জায়িয, তবে সাধারণভাবে প্রাণীর অবয়ববিশিষ্ট চিত্র বা প্রতিকৃতি তৈরি ও ব্যবহার করা হারাম।

দ্বিতীয়ত, এ কথা ঠিক যে, জিনরা সুলাইমান (আ.)-এর জন্য ভাস্কর্য তৈরি করত। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ

-তারা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউযসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত। (সূরা সাবা, আয়াত-১৩)

যদি ধরেও নিই যে, ভাস্কর্যগুলো প্রাণীর অবয়ববিশিষ্ট ছিল, তবুও তাতে আমাদের জন্য প্রাণীর চিত্র বা ভাস্কর্য নির্মাণ করা বৈধ হয় না। কারণ এটি সুলাইমান (আ.)-এর শরীআতে হয়তো বৈধ ছিল; কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শরীআতে বৈধ নয়। রাসূল ﷺ নিজে এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। এমন অনেক কাজ রয়েছে, যা এক নবীর যুগে বৈধ ছিল, অন্য নবীর শরীআতে এসে নিষিদ্ধ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নবী ইয়াকূব (আ.) একসাথে দুজন নারীকে বিয়ে করেছিলেন, যারা পরস্পর সহোদরা ছিল। কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ এর শরীআতে এটি নিষিদ্ধ। নবী ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা তাঁকে সিজদা করেছিলেন। কিন্তু আমাদের নবীর শরীআতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা, চাই ইবাদতের জন্য হোক কিংবা সম্মান প্রদর্শনের জন্য, স্পষ্টত হারাম। তাই সুলাইমান (আ.)-এর সময়কার ভাস্কর্য নির্মাণ করাকে আজকের যুগে ভাস্কর্য নির্মাণ করার দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না, যেহেতু রাসূল ﷺ স্পষ্টভাবে এটিকে নিষেধ করেছেন।

তৃতীয়ত, এটি ঠিক যে, বিভিন্ন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মিত আছে। আমি নিজেই দেখেছি। কিন্তু বিভিন্ন মুসলিম দেশ ইসলামী শরীআতের দলিল নয়, সেসব রাষ্ট্র শরীআহ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছেও না। অপরদিকে আল্লাহ বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

-রাসূল তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো। আর তিনি তোমাদেরকে যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো। (সূরা হাশর, আয়াত-৭)

তাই উপরিউক্ত তিনটি যুক্তি দিয়ে প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ করার বৈধতা দেওয়া যায় না। সুতরাং আলিম-উলামার উচিত হচ্ছে, নির্দ্বিধায় মানুষের কাছে, এমনকি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছে কুরআন-সুন্নাহর দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া এবং নিঃসংকোচে বাতিলের বিরুদ্ধে হকের আওয়াজ উঁচু করা। এটি না করলে নাহী আনিল মুনকারের হক সঠিকভাবে আদায় হবে না। ■

বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

■ ধর্ম-দর্শন, মাসআলা-মাসাইল, ফাদ্বাইল ও আমালিয়াত বিষয়ে লিখুন

■ ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, সমসাময়িক, দেশজ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে তথ্য সমৃদ্ধ লেখা পাঠান

■ মুসলিম মনীষী, আউলিয়াদের জীবন ও গৌরবময় অতীতের আলোকোজ্জ্বল কাহিনি তুলে আনুন আপনার লেখায়

প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পরবর্তী সংখ্যার জন্য নিম্নোক্ত ই-মেইলে লেখা পাঠাতে হবে

E-mail: parwanabd@gmail.com

পরওয়ানা-এর

গ্রাহক হওয়া যাচ্ছে

নিকটস্থ এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন

বার্ষিক চাঁদার হার

বাংলাদেশ	ঃ ৪০০ টাকা
ভারত	ঃ ১৫০০ টাকা
মধ্যপ্রাচ্যের সকল দেশ	ঃ ২০০০ টাকা
যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের সকল দেশ	ঃ ৪০ পাউন্ড/ইউরো
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা	ঃ ৫০ মার্কিন ডলার

এজেন্সির নিয়মাবলি

■ ফোন/ই-মেইল/হোয়াটসঅ্যাপ ও অফিসে যোগাযোগ করে চাহিদা জানালে এজেন্সি দেওয়া হয়

■ ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না

■ প্রত্যেক ৫ কপিতে ১টি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়

■ সরাসরি এজেন্টের কাছে পত্রিকা পৌঁছানো হবে

■ আশেপাশের এজেন্টের ক্ষতি হবে না, এমন নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

■ যেকোনো সময় কর্তৃপক্ষ যে কারো এজেন্টশিপ বাতিল/পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। সেক্ষেত্রে গ্রাহকদের বিকল্প মাধ্যমে পত্রিকা পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে

যোগাযোগ

বিজ্ঞাপন ও বিপণন ব্যবস্থাপক

মাসিক পরওয়ানা

ফুলতলী কমপ্লেক্স, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯

সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন, ৭৪ শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০

রাসূল পাকের শানে
শব্দচয়নের আদব

মুহাম্মাদ সায়ীদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত, তিনি আদম সন্তানের সরদার। উম্মতের জ্ঞাতার্থে অহংকারের দায়মুক্তি ঘোষণা পূর্বক রাসূল ﷺ এই সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের জানান দিতেন। রাসূলে পাক ﷺ বলেছেন– أَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللهِ -আমি আল্লাহ তাআলার নিকট আগের ও পরের সকলের চাইতে অধিক সম্মানিত। (সুনান দারিমী, হাদীস- ৪৮) তিনি বলেছেন–أَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي -আমি আদম সন্তানের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত। (সুনান তিরমিযী, হাদীস- ৩৬১০), কখনো আবার তিনি বলেছেন– أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ -আদম সন্তানের সর্দার আমি। (সুনান আবূ দাউদ, হাদীস- ৪৬৭০)

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্টতা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত। এই সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব যাতে রাসূলের সাথে মুমিনদের আচরণে উদযাপিত হয়, সেজন্য আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফে রাসূলের ক্ষেত্রে আচরণীয় আদব শিক্ষা দিয়েছেন বহুবার ও বহুভাবে। আল্লাহ তাআলা একে অন্যকে সম্বোধনের মত করে রাসূল ﷺ কে সম্বোধন করতে নিষেধ করেছেন, সাধারণভাবে একে অন্যের সাথে যেভাবে কথাবার্তা চলে সেভাবে রাসূলের দরবারে উচ্চ আওয়াজে কথা বলতে বারণ করেছেন এবং রাসূলের শানে বেমানান শব্দচয়ন নিষেধ করেছেন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে সাহাবায়ে কিরাম রাসূল ﷺ কে সম্মান দানের ব্যাপারে সর্বাত্মক যত্নশীল থেকেছেন। নবীজির সম্মানার্থে তাঁর ক্ষেত্রে মার্জিত ভাষাপ্রয়োগ ও যথাযথ শব্দচয়নেও তাঁরা ছিলেন নিষ্ঠাবান। তাঁরা তাঁদের চর্চা ও যাপনে রাসূলে পাকের প্রতি সম্মানবোধ মূর্ত করে তুলতে রাসূলের শানে সর্বদা পরিশীলিত ভাষা প্রয়োগ করেছেন। এমনকি নিজেদের মুখের ভাষাকে পর্যন্ত তাঁরা রাসূলের সম্মানোপযোগী করে নির্মাণ করতেন– হাদীস সাহিত্যে এমন দৃষ্টান্তও প্রচুর। একটি রেওয়ায়াত দেখা যাক। বদরের যুদ্ধে রাসূল ﷺ এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.) বন্দি হওয়ার পরের ঘটনা সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

أَنَّ رِجَالاً مِنْ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا ائْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ فَقَالَ لاَ تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا.

-মদীনার কিছু আনসার সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বললেন, আপনি অনুমতি দিলে আমরা আমাদের বোনের ছেলে আব্বাসের মুক্তিপণ নেয়া বাদ দিব। কিন্তু তিনি বললেন, তোমরা তার (মুক্তিপণের) একটি দিরহামও ছাড়বে না। (বুখারী, হাদীস-২৫৩৭)

হযরত আব্বাস (রা.) নবীজির চাচা। কিন্তু আনসার সাহাবীরা এখানে عمك তথা 'আপনার চাচা' না বলে ابن أختنا তথা 'আমাদের ভাগ্না' বলেছেন। অথচ আব্বাস (রা.) আনসারদের সরাসরি ভাগ্না ছিলেন না, বরং আব্বাস (রা.) এর পিতা আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন আনসারদের বোনের সন্তান। অর্থাৎ দূরসম্পর্কের দিক থেকে আব্বাস (রা.) আনসারদের ভাগ্নেবর্গীয় আত্মীয় । একজন যুদ্ধবন্দিকে নবীজির আত্মীয় হিসেবে উল্লেখ করা তাঁদের কাছে নবীজির শানের জন্য মানানসই মনে হয়নি। তাই তাঁরা আব্বাস (রা.) এর সাথে তাদের নিজেদের দূরবর্তী সম্বন্ধের অভিধা যুক্ত করেছেন। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ফাতহুল বারীতে ইবনুল জাওযীর মত উদ্ধৃত হয়েছে, এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যাপারে সাহাবীদের আদব চর্চার আরেকটি দিক শনাক্ত করে ইবনুল জাওযী বলেছেন–

وإنما قالوا ابن أختنا لتكون المنة عليهم في إطلاقه بخلافه ما لو قالوا : عمك لكانت المنة عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب في الخطاب.

-আনসার সাহাবীরা 'আমাদের ভাগ্না' (ابن أختنا) বলে তাঁদের অনুগ্রহ নিজেদের আত্মীয়র উপর প্রযুক্ত করেছেন। এটা না বলে তারা যদি বলতেন 'আপনার চাচা' (عمك), তাহলে এতে নবীজির প্রতি তাঁদের অনুগ্রহ প্রযুক্ত হতো। এই বিষয়টি তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও কথাবার্তার ক্ষেত্রে চমৎকার আদব চর্চার বহিঃপ্রকাশ। (ফাতহুল বারী, ৫/১৯৯)

সাহাবায়ে কিরাম রাসূল ﷺ এর জন্য সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আতিশয্য বা মুবালাগাহ করেছেন। তারা যা করেছেন, সেটি অবশ্যই মিথ্যা প্রশংসার (المدح الباطل) মাধ্যমে বাড়াবাড়ি নয়। রাসূল ﷺ তাঁর ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করে বলেছেন– তোমরা আমার বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমনটি খ্রিষ্টানরা ঈসা ইবন মারইয়াম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি তো কেবল আল্লাহর বান্দা। তাই তোমরা বল, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল (বুখারী, হাদীস- ৩৪৪৫)। তবে কোনরূপ অসততা, কৃত্রিমতা ও মিথ্যার আশ্রয় ছাড়া রাসূলে পাকের উচ্চ শান ও মর্যাদার প্রতি সশ্রদ্ধদৃষ্টি রেখে তাঁকে সম্মান দেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়তি যত্নশীল হওয়া উম্মতের পক্ষ থেকে রাসূলের প্রতি মুহাব্বাতেরই বহিঃপ্রকাশ। ইমাম তাজুদ্দীন সুবুকী বলেছেন-

....وتعزيره بالمبالغة في تعظيمه ونصرته وإعانته، وعادة الصحابة في ذلك المبالغة، ولو استقصينا ما ورد عنهم في ذلك لطال، وهم وإن بالغوا في ذلك فلم يبلغوا ما هو حقه،

وما أحد من. البشر يطبق القيام بحقه على التمام، لكن بحسب طاقته.

-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাপারে আবশ্যিক হলো তাঁকে সম্মানপ্রদর্শন ও সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে মুবালাগা বা আতিশয্য করার মাধ্যমে তাঁকে মর্যাদা দেওয়া। রাসূলকে সম্মান জানানোর বেলায় সাহাবীদের অভ্যাস ছিলো মুবালাগাহ করা। এ বিষয়ে সাহাবীদের আচরণপদ্ধতির খুঁটিনাটি অনুসন্ধান করলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে। তবে সাহাবীরা রাসূলকে সম্মান জানানোর ক্ষেত্রে যতই মুবালাগাহ বা আতিশয্য করুন না কেন, তবুও তাঁরা তাঁর প্রকৃত হক আদায় করতে পারেননি। মানুষের কারো পক্ষেই এই হক আদায় করা সম্ভব নয়, তবুও সামর্থ্যানুযায়ী যথাসম্ভব চেষ্টা করা উচিত। (আস সাইফুল মাসলুল)

সাহাবীদের পরে উম্মাহর অন্যান্য অনুসরণীয় ইমাম ও সালাফে সালিহীনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানে কথা বলার ক্ষেত্রে পূর্ণ শিষ্টাচার অবলম্বন করার এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। রাসূলের আদব রক্ষায় এই উম্মাহ যে আপোষহীনতার নীতিতে কতটা দৃঢ় থেকেছে, তার কিছু দৃষ্টান্ত দেখা যাক। হযরত উমর ইবন আব্দুল আযীয (র.) এর একটি ঘটনা ইমাম আবূ নুআইম আল ইসফাহানী (র.) বর্ণনা করেছেন–

أَنَّ عمر بن عبد العزيز أُتِيَ بِكَاتِبٍ يَخُطُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَكَانَ مُسْلِمًا، وَكَانَ أَبُوهُ كَافِرًا، فَقَالَ عمر لِلَّذِي جَاءَ بِهِ: لَوْ كُنْتَ جِئْتَ بِهِ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ الْكَاتِبُ: مَا ضَرَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفْرُ أَبِيهِ، فَقَالَ عمر وَقَدْ جَعَلْتَهُ مَثَلًا؟ لَا تَخُطُّ بَيْنَ يَدَيَّ بِقَلَمٍ أَبَدًا.

-হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয (র.) এর সামনে এক অনুলেখককে নিয়ে আসা হলো, যে তার সামনে (রাজদরবারে) লিখবে। ঐ লোক মুসলিম ছিলেন, কিন্তু তার বাবা ছিলেন কাফির। যে ব্যক্তি এই অনুলেখককে নিয়ে এসেছিলেন তাকে উমর ইবন আব্দুল আযীয (র.) বললেন– মুহাজিরদের সন্তানদের মধ্যে থেকে একজন নিয়ে আসতে! তখন ঐ অনুলেখক বলে উঠলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাবার কুফর তো রাসূলের কোনো ক্ষতি করেনি। এ কথা শুনে উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রেগে গিয়ে) বললেন, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদাহরণ বানিয়ে নিয়েছো? তুমি আর কখনো আমার সামনে কলম দিয়ে লিখবে না। (হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তবাকাতুল আছফিয়া, ৫/২৮৩)

কেউ কখনো রাসূলে পাকের জন্য অবমাননাকর শব্দ ও বাক্যচয়ন করলে, এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম অত্যন্ত কঠোর ফতোয়া দিয়েছেন। যেমন, ইমাম কাযী ইয়ায (র.) উল্লেখ করেছেন–

وَأفْتى أَبُو الْحَسَن القابِسيّ فِيمَن قَال فِي النبي صلى الله عليه وسلم الْجَمَّال يَتِيم أَبِي طَالِب بالْقَتْل، وَأفْتى أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي زيد بِقَتْل.

-রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে "উটওয়ালা, আবূ তালিবের ইয়াতীম" বলা ব্যক্তির ব্যাপারে আবুল হাসান আল কাবিসী মৃত্যুদণ্ডের ফাতওয়া দিয়েছেন। আবু মুহাম্মাদ ইবন আবী যাইদও মৃত্যুদণ্ডের ফাতওয়া দিয়েছেন। (আশ শিফা বি তারীফি হুকুকিল মুস্তাফা, ২/২১৭)

ইমাম তাকিউদ্দীন সুবুকী (র.) উল্লেখ করেছেন–

قال القاضي أبو عبد الله ابنُ المُرابط : مَن قال إن النبيَّ ﷺ هُزِمَ يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقال حبيب بن ربيع القَرَوِيُّ : مذهب مالك وأصحابه أن من قال فيه عليه السلام ما فيه نقص قُتِلَ دون استتابة.

-কাযী ইবনুল মুরাবিত ফতোয়া দিয়েছেন, যে বলবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরাজিত হয়েছেন, তাকে তওবা করতে বলা হবে। তাওবা না করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। আর হাবীব ইবন রাবী বলেন, মালিকী মাযহাবের ফাতওয়া হলো, যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাপারে সমস্যাজনক কোন কথা বলবে, তার কাছ থেকে তাওবা তলব না করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। (আস সাইফুল মাসলুল, পৃ-৪০৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সম্পূর্ণভাবে খুঁতমুক্ত। তাঁর কিছু বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো, যেগুলো নবুওয়াত-রিসালাতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাবক ছিলো এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হিকমাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এসব বৈশিষ্ট্য ও তাঁর জীবনের বিশেষ দিকগুলোর ব্যাপারেও কথাবলার ক্ষেত্রে যথোচিত আদবের অনুশীলনে উলামায়ে কিরামের অত্যন্ত গভীর মনোযোগ ছিলো। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কিছু বিশেষ অবস্থা কিংবা বৈশিষ্ট্যাবলি ব্যাপারে বলেন–

إِنَّ الْمُسْتَدِلَّ تَارَةً يَكُونُ فِي مَقَامِ التَّدْرِيسِ وَالْإِفْتَاءِ وَالتَّصْنِيفِ وَتَقْرِيرِ الْعِلْمِ بِحَضْرَةِ أَهْلِهِ، وَهَذَا لَا إِنْكَارَ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي، وَتَارَةً يَكُونُ فِي الْخِصَامِ وَالتَّبَرِّي مِنْ مَعَرَّةٍ أَوْ نَقْصٍ يُنْسَبُ إِلَيْهَا هُوَ أَوْ غَيْرُهُ، وَهَذَا مَحَلُّ الْإِنْكَارِ وَالتَّأْدِيبِ لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ بِحَضْرَةِ الْعَوَامِ وَفِي الْأَسْوَاقِ، وَفِي التَّعَارُضِ بِالسَّبِّ وَالْقَذْفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

এগুলো দিয়ে যিনি ইস্তিদলাল করবেন, তিনি হয়তো তা করবেন পঠন-পাঠন, ফাতওয়া, লেখালেখি-গবেষণার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিদের সামনে। এটি দোষের নয়। আবার কখনো হয়ত তিনি ইস্তিদলাল করবেন তর্ক-বিবাদ, দোষ থেকে দায়মুক্তি অথবা তার বা অন্য কারো দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে। এটা নিন্দনীয় ও তিরস্কারযোগ্য। বিশেষত এটা যদি হয় সাধারণ মানুষের সামনে, বাজারে কিংবা গালাগাল বা বাদানুবাদের মুখে। (আল হাবী লিল ফাতাওয়া, ১/২৭৬)

রাসূলে পাকের আলোচনা করার ক্ষেত্রে উদাসীনতা দেখানো কিংবা মামুলি বিষয়ের মত অনুরাগবিহীন কথা বলা অনুচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আলোচনাকালে উম্মাহর সালাফরা পূর্ণ গাম্ভীর্য অবলম্বন করতেন। ইমাম কাযী ইয়ায (র.) বলেছেন– وقد كَان السَّلَف تَظْهَر عَلَيْهِم حَالَات شَدِيدَة عِنْد مُجَرَّد ذِكْرِه -রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আলোচনাকালে সালাফ তথা পূর্ববর্তীদের মধ্যে বিশেষ অবস্থা পরিলক্ষিত হতো। (আশ শিফা বিতারীফি হুকুকিল মুস্তাফা, ২/২৫৪)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষেত্রে অনুসরণীয় আদবগুলো আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে শিক্ষা দিয়েছেন এবং এর ব্যত্যয় ঘটলে ব্যক্তির অজান্তেই তার আমল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। আল্লাহ বলেছেন- হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজ উঁচু করো না এবং তোমরা নিজেরা পরস্পর যেমন উচ্চস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরকম উচ্চস্বরে কথা বলো না। এ আশঙ্কায় যে তোমাদের সকল আমল-নিষ্ফল হয়ে যাবে অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না। (সূরা হুজুরাত, আয়াত-২) আবার, কোন ব্যক্তি একটি মাত্র ভুল শব্দ বা বাক্য বলার পরিণামে জাহান্নামের গভীর তলদেশে নিক্ষিপ্ত হবে বলে সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ.

-আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন যে, নিশ্চয়ই বান্দা চিন্তাভাবনা ছাড়াই এমন শব্দ উচ্চারণ করে ফেলে যার কারণে সে জাহান্নামের এমন গভীরে প্রবেশ করবে যার দূরত্ব পূর্ব (পশ্চিম) এর দূরত্বের চেয়েও বেশি। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৬৪৭৭)

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ফাতহুল বারীতে উদ্ধৃত ইমাম কাযী ইয়াযের বক্তব্যে আমল ধ্বংসকারী সম্ভাব্য শব্দ বা শব্দসমষ্টির মধ্যে নবুওয়তের হকের ক্ষেত্রে অবমাননাকর শব্দও রয়েছে। (ফাতহুল বারী, ১১/৩১৬)

অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানে শব্দচয়ন ও তাঁর ব্যাপারে কথা বলার ক্ষেত্রে আদবের ব্যাপারে উদাসীন থাকার সুযোগ নেই। রাসূলে পাকের আদব লঙ্ঘনে ব্যক্তির জীবনের সব আমল ধ্বংস ও পরকালে জাহান্নাম নির্ধারিত হতে পারে। ■

আমার দেখা একজন শাইখুল হাদীস

মোহাম্মদ খছরুজ্জামান

আল্লামা হবিবুর রহমান (র.)। বহু বিশষণে বিশেষিত প্রথিতযশা একজন আলিমে দ্বীন। 'মুহাদ্দিস ছাহেব' বলতে আমরা তাকেই জানতাম, বুঝতাম, আরো অনেক মুহাদ্দিস মওজুদ থাকা সত্ত্বেও। ৭ ফেব্রুয়ারি তাঁর ওফাত বার্ষিকী। ২০২২ সালের এই দিনে তিনি ইন্তিকাল করেন। অনেকের মতো আমিও তাঁর স্নেহপ্রাপ্ত। তাঁর স্মৃতিচারণে এই সংক্ষিপ্ত লেখা। এটা ধারাবাহিক জীবনী নয়। নয় মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণধর্মী কিছু। সাদামাটা বয়ান।

এক. মুহাদ্দিস ছাহেবের বয়ান প্রথম শুনেছি জকিগঞ্জের গোটারগ্রাম ইয়াকুবিয়া মাদরাসায়। এর পূর্বে অনেকবার অনেক জায়গায় দেখেছি। আছে শুধু দেখার স্মৃতি। সেদিন রেখেছিলেন এক রাজকীয় বয়ান। বাদ আসর থেকে মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত। দেশে প্রচলিত কতিপয় ইখতিলাফী বিষয় নিয়ে। অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় উপস্থাপন করলেন বিরোধপূর্ণ কয়েকটি বিষয়। দেখালেন পক্ষের-বিপক্ষের দলীল দাবি এবং আমল। বিভিন্ন কিতাবের রেফারেন্স। আলোচনা এমনভাবে করলেন, মনে হলো তিনি কোনো পক্ষের নন। প্রতিটি বিষয়ের উপসংহারে বললেন– আমার হুরুতামী (কমবয়সী লোক) কথা এই...। গাঁউয়ালী (গ্রাম্য) এক ফয়সালা এই...। পরবর্তীতে এসে বুঝলাম, হুরুতামী আর গাঁউয়ালী বলতে অন্য কিছু না। নিজেকে সচেতনভাবে লুকিয়ে রাখার পাকাপোক্ত কৌশল। নিজেকে আড়াল রাখার নিজ থেকে আবিষ্কৃত পরিভাষা। নিজস্ব অভিমত প্রকাশের বিনীত ভাষা।

দুই. জন্মসূত্রে আমরা একই উপজেলার অধিবাসী। মুহাদ্দিস ছাহেব আমাদের প্রতিবেশী। শৈশব থেকেই দেখে আসছি। দেখে দেখে বড় হয়েছি। ভদ্রতা নম্রতা জীবনের ভূষণ। তিনি ভূষণ বানিয়েছিলেন পরেছিলেন। দাপট প্রভাব তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। অত্যন্ত বিনয়ী বেশে তিনি কাটিয়েছেন একটি বর্ণাঢ্য জীবন। বিচ্ছিন্ন দু'তিনেক চিত্র দেখাবো, যা থেকে তাঁর ভদ্রতা ও নম্রতার পরিচয় ফুঁটে উঠে।

বার্ষিক পরীক্ষা পরবর্তী বন্ধে বাড়িতে ছিলাম। জলসার মৌসুম। আমার পার্শ্ববর্তী গ্রাম রায়গ্রাম। সেলিনা ইসলাম হাফিযী মাদরাসার জলসা। জলসা পূর্ববর্তী রাতে প্রচুর বৃষ্টি হলো। জলসায় গেলাম। জানলাম বাদ যুহর বয়ান রাখবেন মুহাদ্দিস ছাহেব। বেশ আনন্দবোধ করলাম। তিনি বাদ যুহর স্টেজে আসলেন। যথারীতি শুরু হলো বয়ান। আনুমানিক বয়ানের আধ ঘন্টার মাথায় পানি চাইলেন। পানির কথা মাইকে শুনা গেলো। আরো ১৫/২০ মিনিট বয়ান চললো। পানি আসলো না। আচমকা হাস্যরসে বললেন, গতরাতে প্রচুর বৃষ্টি হলো, এরপরও কী পানির অভাব? মূলত: স্টেইজের জিম্মাদার পানির কথা শুনেননি। অভিযোগ উত্থাপনের নিপূণতা, চমৎকার শব্দসুষমায়।

সৎপুর মাদরাসার বার্ষিক মাহফিল। একবার তিনি একটু আগেভাগে পৌঁছে গেলেন। মাহফিল শুরু হবে বাদ যুহর। তিনি হাযির হলেন দুপুর ১২টায়। পাকিছিরির প্রিন্সিপাল হুযুর তাকে নিয়ে গেলেন নিজ কামরায়। আমি তাদের পিছু ধরলাম। কামরায় কেবল আমরা ৩ জন। মুহাদ্দিস ছাহেব জুতা মোজা খুলে উযূর প্রস্তুতি নিলেন। পুরাতন একটি স্যান্ডেল ব্যবহার করতে অনুমতি চাইলেন। লজ্জা পাকিছিরি হুজুরকে ঘিরে বসলো। আমি থ হয়ে তাকালাম। ভদ্রতা অবলোকন করলাম যুগশ্রেষ্ঠ একজন হাদীস বিশারদের।

লালারগাঁও মাদরাসার বার্ষিক জলসা। বাদ মাগরিব বয়ান রাখছেন কালারুকী ছাহেব। ইতোমধ্যে মুহাদ্দিস ছাহেব লালারগাঁও পৌঁছে গেলেন। তিনি সরাসরি স্টেইজে উঠলেন। কালারুকী ছাহেব তাঁর উপস্থিতি আঁচ করতে পারলেন না বয়ানে মগ্ন থাকায়। মুহাদ্দিস ছাহেব পিছন থেকে ক্ষীণ স্বরে বললেন, কালারুকী ছাহেব সুযোগ দিলে আমি বসি, একটু তাড়া আছে। কালারুকী থতমত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। অভিনব ভঙ্গিমায় বলে উঠলেন, ইয়া আল্লাহ! ডিসির কাজে চৌকিদারের পারমিশন লাগে না। মুহাদ্দিস ছাহেব ব্যক্তিত্বের বদলে ভদ্রতা নম্রতা বেছে নিয়েছিলেন। বিধায় উল্লেখযোগ্য অবস্থানে আসীন ছিলেন উলামা হযরতসহ সর্বসাধারণের কাছে।

তিন. তিনি সারাজীবন মগ্ন বিভোর ছিলেন দ্বীনের তাবলীগে। জীবনের বৃহৎ অংশ কাটিয়েছেন ওয়ায-নসীহতের মজলিস-মাহফিলে। বয়ানের ধরন অনন্য বৈশিষ্ট্যের। বয়ান হতো বিষয়ভিত্তিক। তাঁর বয়ান শুনেছি সচেতনভাবে তিন দশক। বিষয় ছাড়া কোনো আলোচনা ছিল না। বিষয়কে ফুটিয়ে তুলতে যত্ন এবং সচেতনতা লক্ষণীয়। বিষয় থেকে প্রাসঙ্গিকে যেতেন। অসম্ভব সক্ষমতা ছিল তড়িৎ ফিরে আসার। বয়ানে এলোমেলো আজগুবি কল্প-কাহিনীর উপস্থিতি ছিলো না। বিষয়ের উপর কিতাবী দলীল পেশ করতে তিনি সময়ের এক কিংবদন্তি। মাছরাঙা পাখি মুহূর্তের মধ্যে মাছ নিয়ে জল থেকে বেরিয়ে আসে। তদ্রুপ কিতাব থেকে দলীল নিয়ে মঞ্চে আসার এক বিরল দৃষ্টান্ত তিনি।

ভদ্রতা নম্রতার সর্বোচ্চ শিখরে আসীন মনীষী হিসেবে দেখেছি তাকে। তাই বলে বাতিলের ব্যাপারে তাকে নিরপেক্ষ দেখিনি কোনোদিন। বাতিলের ব্যাপারে তিনি মর্দে মুজাহিদ। সময়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিবাদী পুরুষ। সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা নিরূপণে আজীবন লড়েছেন। বাতিলকে বাতিল সাব্যস্ত করতে স্বভাবজাত নম্রতা তাকে আটকিয়ে রাখতে পারেনি। কিতাবকে বানিয়েছিলেন প্রতিবাদী বর্শা। বাতিলের মুখোশ উন্মোচনে নির্ভরযোগ্য দলীল, শালীন শব্দ, যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য উপস্থাপন করতে দেখেছি। হিংসাত্মক মনোভাব, পরশ্রীকাতর দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত ছিল। তিনি আজীবন প্রতিবাদী মঞ্চে লড়েছেন। তবে প্রতিবাদের বৈশিষ্ট্য এবং ধরন ছিল ভিন্ন ধাঁচের। তিনি ব্যক্তি ঘায়েল করতেন না, ব্যক্তির বদ আকীদা বাতিল প্রমাণ করতেন দলীলের ভিত্তিতে। ইলমী যোগ্যতা, বয়ানের অনন্য বৈশিষ্ট্য, গ্রহণযোগ্য প্রতিবাদী কৌশলে তিনি ছিলেন গ্রহণীয় বরণীয়, বিরোধী বলয়েও। কোনো বক্তব্যের জন্য কোনোদিন ক্ষমা চাইতে হয়নি। এমনকি ন্যূনতম দুঃখ প্রকাশও। অথচ আজীবন তাকে দেখেছি, তিনি সময়ের মর্দে মুজাহিদ, আপসহীন প্রতিবাদী পুরুষ।

চার. মুহাদ্দিস ছাহেব তাঁর সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য হাদীস বিশারদ। ইলমে হাদীসের উপর তাঁর পাণ্ডিত্য কিছুটা অনুমান করা যেতো তাঁর দারসে বয়ানে। আমার দুর্ভাগ্য, কামিল জামাআতের ক্লাসে তাঁর দারসে শরীক হতে পারিনি। খুসুসী বেশ ক'টি দারসে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। সৎপুর মাদরাসায়, থানাবাজার মাদরাসা ও মসজিদে, রারাই আল হাবীব জামে মসজিদে। দারসগুলোতে যে স্বাদ অনুভব করেছি, তা যথাযথ বর্ণনার সামর্থ্য নেই। শিক্ষক পাঠের প্রতি যত পারদর্শী, তার পাঠদান ততো প্রাণবন্ত হয়। ➤ ২২ পৃষ্ঠায় দেখুন

জুমুআর দিনের বিশেষ আমল

ইবরাহীম আরিফ

মহান রাব্বুল আলামীনের অসীম দয়া উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর। তারা দুনিয়াতে সর্বশেষে আগমন করলেও জান্নাতে প্রবেশ করবে সবার আগে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : نَحْنُ الآخِرُونَ، الأَوَّلُونَ يَومَ القِيامَةِ، وَنَحْنُ أَوَّلُ مَن يَدْخُلُ الجَنَّةَ

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমরা সবশেষে আগত উম্মাত, কিন্তু কিয়ামাতের দিন আমরা হবো সর্বাগ্রবর্তী, আমরাই প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব।

أَنَّهُمْ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِنا، وأُوتِيناهُ مِن بَعْدِهِمْ، فاخْتَلَفُوا، فَهَدانا اللَّهُ لِما اخْتَلَفُوا فيه مِنَ الحَقِّ،

অথচ তাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে এবং আমাদেরকে তা দেওয়া হয়েছে তাদের পরে। তারা বিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়লো কিন্তু তারা যে সত্য দ্বীনের ব্যাপারে বিরোধে লিপ্ত হয়েছিল, আল্লাহ আমাদেরকে সে দ্বীন সম্পর্কে হিদায়াত দান করেছেন।

فَهذا يَوْمُهُمُ الذي اخْتَلَفُوا فِيهِ، هَدانا اللَّهُ له، قالَ: يَوْمُ الجُمُعَةِ، فالْيَومَ لَنا، وغَدًا لِلْيَهُودِ، وبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصارى.

তিনি বলেন, তারা যে (সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ) দিন নিয়ে মতবিরোধ করেছিলো, এই জুমুআর দিনই হচ্ছে সেই দিন। আল্লাহ আমাদেরকে এই দিনের ব্যাপারে হিদায়াত দান করেছেন। তাই আমাদের জন্য (ফদীলতপূর্ণ শ্রেষ্ঠ দিন) হচ্ছে জুমুআর দিন। আর ইয়াহুদীদের জন্য পরের দিন এবং খ্রিষ্টানদের জন্য তারও পরের দিন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৮৬৫)

الراوي: أبو هريرة • مسلم، صحيح مسلم (٥٥٨) • [صحيح] • أخرجه البخاري (٦٧٨)، ومسلم (٥٥٨)

তারা সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন নিয়ে ইখতিলাফ করার কারণ কী ছিলো? মুসলিম শরীফের ব্যখ্যা গ্রন্থ 'শরহে নববী'তে ইমাম নববী (র.) বর্ণনা করেন,

قال القاضي : الظاهر أنه فرض عليهم تعظيم يوم الجمعة بغير تعيين ووكل إلى اجتهادهم لإقامة شرائعهم فيه، فاختلف اجتهادهم في تعيينه ولم يهدهم الله له، وفرضه على هذه الأمة مبينا، ولم يكله إلى اجتهادهم ففازوا بتفضيله. قال: وقد جاء أن موسى عليه السلام أمرهم بالجمعة وأعلمهم بفضلها فناظروه أن السبت أفضل، فقيل له : دعهم.

ইমাম কাযী ইয়ায (র.) বলেন, হাদীসের বাহ্যিক অর্থ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ তাআলা তাদের উপর জুমুআবার তথা শ্রেষ্ঠ দিনকে তাযীম করা ফরয করেছিলেন। কিন্তু সেই দিনটি নির্দিষ্ট করে না দিয়ে বরং তা নির্বাচন করার দায়িত্ব তাদের ইজতিহাদের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। তখন তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত না পেয়ে সেই দিনের ব্যাপারে ইখতিলাফ করে। আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে সেই শ্রেষ্ঠ দিন নির্বাচন করা তাদের ইজতিহাদের উপর ন্যস্ত না করে তিনি নিজেই স্পষ্ট বর্ণনা করে দিলেন, এতে তারা অধিক মর্যাদাবান হলো।

কাযী ইয়ায (র.) আরও বলেন, মূসা (আ.) শ্রেষ্ঠ দিন তথা জুমুআবারের ফদীলত অধিক জানেন বিধায় তিনি সেই দিন সম্পর্কে তাদের আদেশ করেছিলেন, কিন্তু তারা শনিবার শ্রেষ্ঠ বলে ইখতিলাফ করে। তখন আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দেন, তাদেরকে তাদের মতের উপর ছেড়ে দাও । (শরহু মুসলিম, ইমাম নববী (র.) কৃত, (كتاب الجمعة بَابٌ : هِدَايَةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ

সুতরাং এই জুমুআবার আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এক বিশেষ উপহার। জুমুআবার মর্যাদাপূর্ণ দিন হওয়ার কারণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ،

নিশ্চয়ই জুমুআর দিন হলো সমস্ত দিনের সর্দার । জুমুআর দিন আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে মহান দিবস। এমনকি এদিন আল্লাহ তাআলার কাছে ঈদুল আদহা ও ঈদুল ফিতর তথা ইসলামের দুই ঈদের দিন থেকেও মহান।

فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ: خَلَقَ اللهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللهُ فِيهِ آدَمَ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا،

জুমুআর দিনের বিশেষ পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ দিন আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন। এ দিন তাঁকে জান্নাত থেকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এদিনেই আল্লাহ তাঁকে ইন্তিকাল দান করেছেন। জুমুআর দিন একটা সময় আছে, যেসময় বান্দা আল্লাহর কাছে যা চাইবে আল্লাহ তাআলা তাকে তা-ই দান করবেন, যদি না সে হারাম কোনো বিষয়ের প্রার্থনা করে।

وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَلَا أَرْضٍ وَلَا سَمَاءٍ، وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ، إِلَّا وَهُنَّ مُشْفِقُونَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

তদ্রূপ, কিয়ামতও সংঘটিত হবে জুমুআর দিনেই । নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতারা পর্যন্ত জুমুআর দিন (কিয়ামতের আশঙ্কায়) ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। পৃথিবী, আকাশ, বাতাস, পাহাড়, পর্বত, সাগর সবকিছু জুমুআর দিন (কিয়ামতের আশঙ্কায়) উদ্বিগ্ন থাকে । (মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৫৫৫৯; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৫৫৪৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১০৮৪)

তবে বড় আফসোস! মানুষ আর জিন জাতি এ ব্যাপারে গাফিল থাকে। আবূ হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا يَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا هَذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ .قال الشيخ شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم.

মানুষ ও জিন ব্যতীত এমন কোনো প্রাণী নেই, যা জুমুআর দিন (কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কায়) ভীতসন্ত্রস্ত থাকে না। (মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, হাদীস-৫৫৬৩; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৭৬৮৭)

জুমুআর দিনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, জুমুআবার রাতে আল্লাহ তাআলার কাছে বান্দাদের আমলনামা পেশ করা হয়। আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন-

إن أعمالَ بني آدمَ تُعرضُ كلَّ خميسٍ ليلةَ الجمعةِ فلا يُقبلُ عملُ قاطعِ رحمٍ

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে অর্থাৎ জুমুআর রাতে আদম সন্তানের আমল (আল্লাহর সামনে) পেশ করা হয়। তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদের আমল কবুল করা হয় না। (মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১০২৭২; আল আদাবুল মুফরাদ, হাদীস-৬১)

যেহেতু এই জুমুআবার শ্রেষ্ঠ মর্যাদাপূর্ণ দিন, সুতরাং এই দিনের জন্য চাই বিশেষ প্রস্তুতি। হাদীসে এই দিনে কিছু বিশেষ আমলের প্রতি তাগিদ দেওয়া হয়েছে। এবং সেই আমলগুলোর বিশেষ ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা ধারাবাহিকভাবে সেগুলো আলোকপাত করার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

জুমুআর দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হচ্ছে জুমুআর নামায আদায় করা। কারণ জুমুআকে আল্লাহ তাআলা বান্দার উপর ফরয করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

হে মুমিনগণ! জুমুআর দিন যখন নামাযের জন্য ডাকা হয়, তখন আল্লাহর যিকরের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর। (সূরা জুমুআহ, আয়াত-৯)

আল্লাহ তাআলা জুমুআর আযান হলে ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করে তাঁর যিকরের প্রতি ধাবিত হতে আদেশ করেছেন, আল কুরআনের মধ্যে আল্লাহর স্পষ্ট আদেশ, ফরয অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

الجُمُعةُ حَقٌّ واجِبٌ على كلِّ مُحْتلِمٍ.

الراوي: حفصة • جمال الدين المرداوي، كفاية المستقنع لأدلة المقنع (٢٨٢) • إسناده جيد

প্রত্যেক সাবালক পুরুষের উপর জুমুআ আদায় করা অত্যাবশ্যক দায়িত্ব। (কিফায়াতুল মুসতানকি, ২৮২)

তবে চার শ্রেণির উপর জুমুআ ফরয নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

الجمعةُ حقٌّ واجبٌ في جماعةٍ، إلا أربعةً: عبدٌ مملوكٌ، أو امرأةٌ، أو صبيٌّ، أو مريضٌ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জুমুআর নামায প্রত্যেক মুসলিমের উপর জামাআতের সাথে আদায় করা ফরয। তবে চার শ্রেণির লোকের জন্য ফরয নয়; ক্রীতদাস, নারী, শিশু ও রোগী। (সুনান আবূ দাঊদ, ১০৬৭)

জুমুআর নামায ত্যাগকারীর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কঠিন ধমক রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

যে ব্যক্তি অলসতা করে পরপর তিনটি জুমুআহ ত্যাগ করে মহান আল্লাহ তার অন্তরে সীলমোহর মেরে দেন। (সুনান আবূ দাঊদ, ১০৫২)

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

من ترك ثلاثَ جمعاتٍ من غيرِ عذرٍ كتب من المنافقين

যে ব্যক্তি বিনা ওযরে তিনটি জুমুআ ত্যাগ করল তাকে মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়! (মাজমাউয যাওয়াইদ, ২/১৯৬, তাবারানী, হাদীস-৪২৪)

তবে কেউ যদি ওযরের কারণে জুমুআ না পড়তে পারে, তবে সে যুহরের নামায আদায় করে নিবে। আর কেউ যদি বিনা ওযরে জুমুআ ত্যাগ করে যুহর পড়ে, তবে তার নামায মাকরূহের সাথে আদায় হবে। আল ইখতিয়ার লি তালিলিল মুখতার কিতাবে ইমাম মুসিলী (র.) বলেন,

ومن صلى الظهر يوم الجمعة بغير عذر جاز و يكره.

অর্থাৎ বিনা ওযরে জুমুআ ত্যাগ করে যুহর পড়লে তা মাকরূহের সাথে আদায় হবে। (আল ইখতিয়ার, ১/২৭৯)

তো এই ফরয জুমুআর নামায আদায়ের সাথে কিছু সুন্নাত কাজ জড়িত রয়েছে, যেগুলো আদায় করলে বিশেষ ফযীলত পাওয়া যায়। সেই কাজগুলো হচ্ছে,

১. উত্তমভাবে মিসওয়াক করা, এবং গোসল করা। জুমুআর দিন গোসল করা সুন্নাত। তবে গোসলের সুযোগ না থকলে অবশ্যই উযূ করে নিবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ

-যে ব্যক্তি জুমুআর দিন উযূ করল, সে তো ভালো ও উত্তম কাজ করল। আর যে গোসল করলো সে অধিকতর উত্তম কাজ করল। (সুনান আবূ দাঊদ, হাদীস-৩৫৪)

২. উত্তম পোশাক পরিধান করা।

৩. সুগন্ধি ব্যবহার করা।

৩. কাউকে না ডিঙিয়ে সামনের ফাঁকা জায়গা পূরণ করে যতটুকু সম্ভব ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বসা।

৪. খুতবাহ শুরুর পূর্বে, সাধ্যমতো নফল নামায আদায় করা।

৫. কোনোরূপ অনর্থক কথা না বলে মনযোগ দিয়ে ইমামের খুতবাহ শুনা। এই কাজগুলোর ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ– إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا. قَالَ وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ "وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ".

-যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে উত্তম পোশাক পরিধান করবে, তার কাছে সুগন্ধি থাকলে ব্যবহার করবে, তারপর জুমুআর সালাত আদায়ের জন্য মাসজিদে যাবে, সামনে যাওয়ার জন্য লোকদের ঘাড় টপকাবে না এবং যথাসাধ্য সালাত আদায় করে ইমামের খুতবার জন্য বের হওয়া থেকে সালাত শেষ করা পর্যন্ত সময় নীরবতা অবলম্বন করবে- তাহলে এটা তার জন্য এ জুমুআ ও তার পূর্ববর্তী জুমুআর মধ্যবর্তী যাবতীয় (সগীরা) গুনাহর কাফফারা হয়ে যাবে। আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, আরো তিন দিনের গুনাহেরও কাফফারা হবে। কেননা নেক কাজের সাওয়াব (কমপক্ষে) দশ গুণ হয়। (সুনান আবূ দাঊদ, হাদীস-৩৪৩)

৬. পায়ে হেঁটে যাওয়া।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا

-যে ব্যক্তি জুমুআহর দিন গোসল করবে এবং (স্ত্রীকেও) গোসল করাবে, প্রত্যুষে ঘুম থেকে জাগবে এবং (পরিবারের অন্যান্যদের ও) জাগাবে, জুমুআর জন্য বাহনে চড়ে নয় বরং পায়ে হেঁটে মাসজিদে যাবে এবং কোনরূপ অনর্থক কথা না বলে ইমামের নিকটে বসে খুতবা শুনবে, তার (মাসজিদে যাওয়ার) প্রতিটি পদক্ষেপ সুন্নাত হিসেবে গণ্য হবে এবং প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে সে এক বছর যাবত সিয়াম পালন ও রাতভর সালাত আদায়ের (সমান) সাওয়াব পাবে। (সুনান আবূ দাঊদ, হাদীস-৩৪৫)

৮. যথাসম্ভব আগেভাগে জুমুআর দিন মসজিদে যাওয়া।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى باب الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

-জুমুআর দিন মসজিদের দরজায় ফেরেশতাগণ অবস্থান করেন এবং ক্রমানুসারে পূর্বে আগমনকারীদের নাম লিখতে থাকেন। যে সবার পূর্বে আসে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি মোটাতাজা উট কুরবানী করে।

অতঃপর যে আসে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি গাভি কুরবানী করে। অতঃপর আগমনকারী ব্যক্তি মোরগ দানকারীর ন্যায়। অতঃপর আগমনকারী ব্যক্তি একটি ডিম দানকারীর ন্যায়। অতঃপর ইমাম যখন বের হন তখন ফেরেশতাগণ তাঁদের খাতা বন্ধ করে দিয়ে মনোযোগ সহকারে খুতবাহ শ্রবণ করতে থাকেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৯২৯)

৯. কাবলাল জুমুআ চার রাকাআত, এবং বাদাল জুমুআ চার রাকাআত আদায় করা যা সুন্নতে মুআক্কাদা।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا

-আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা.) জুমুআর (ফরযের) পূর্বে চার রাকাআত এবং পরে চার রাকাআত (সুন্নাত) নামায আদায় করতেন। (জামে আত তিরমিযী, হাদীস-৫২৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا

-তোমাদের কেউ যখন জুমুআর সালাত আদায় করে, তখন সে যেন তার পরে চার রাকাআত (সুন্নাত) সালাত আদায় করে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৯২১)

যেসব কাজগুলো জুমুআর সাওয়াবকে বরবাদ করে দেয়

১. খুতবাহ'র সময় কথা বলা

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ. وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, জুমুআর দিন যখন তোমার পাশের মুসল্লীকে চুপ থাকো বলবে, অথচ ইমাম খুতবাহ দিচ্ছেন, তাহলে তুমি একটি অনর্থক কথা বললে। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৯৩৪)

খুতবাহ চলাকালীন সময়ে নামায এবং তাসবীহ পড়ার হুকুম

ইমাম আবুল হাসান আল কুদূরী (র.) বলেন,

وإذا خرج الإمام على المنبر يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته.

অর্থাৎ যখন ইমাম সাহেব মিম্বরে আরোহন করবেন তখন মুসল্লিরা নামায পড়া ও কথা বলা বন্ধ করে দিবে যতক্ষণ না ইমাম সাহেব খুতবাহ শেষ করেন।

ইমাম তাহতাবী (র.) বলেন, পুরাতন কাযা নামায, তিলাওয়াতে সিজদা, মান্নতের নামাযসহ সকল ধরনের নফল নামায তখন বন্ধ রাখবে। তবে যদি জুমুআর আগের ওয়াক্তের নামায কাযা থাকে যা জুমুআহ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য জরুরি (অর্থাৎ ওয়াক্তিয়া নামায বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য পিছনের কাযা নামায যা ৬ ওয়াক্ত থেকে কম, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব। সুতরাং) সেই কাযা নামায খুতবাহ চলাকালীন পড়তে পারবে।

আর কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাখ্যা হচ্ছে: ইমাম সাহেব মিম্বরে আরোহন করা মাত্র দুনিয়াবি সব কথাবার্তা বন্ধ থাকবে। তবে খুতবাহ শুরুর পূর্বে তাসবীহ এবং যিকর পড়তে পারবেন। সুতরাং মুসল্লীরা মুআযযিনের আযানের জবাব দিবেন। কারণ সহীহ বুখারীতে এসেছে, মুআবিয়া (রা.) মিম্বরে বসে আযানের জবাব দিয়েছেন। এবং বলেছেন,

قال: يا أيُّها النَّاسُ، إنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على هذا المَجْلِسِ، حِينَ أذَّنَ المُؤَذِّنُ، يقولُ ما سَمِعْتُمْ مِنِّي مِن مَقالَتِي.

-হে লোকসকল! তোমরা আমার হতে যে বাক্যগুলো শুনেছ, তা আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে মুয়াযযিনের আযানের সময় এ মজলিসে বাক্যগুলো বলতে আমি শুনেছি। (বুখারী, ৯১৪; হাশিয়াতুত তাহতাবী, ৫১৮)

২. খুতবার সময় অমনোযোগী থাকা, পাথর বা অন্য কিছু নাড়াচাড়া করা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ভালোভাবে উযূ করে জুমুআর নামায আদায় করতে আসে, ইমামের নিকটবর্তী হয়ে মনোযোগ সহকারে নীরবে খুতবা শুনে, তাঁর এ জুমুআ হতে ঐ জুমুআ পর্যন্ত এবং আরো তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি কাঁকর-বালি ইত্যাদি নাড়াচাড়া করলো সে বাজে কাজ করলো। (সহীহ ইবন মাজাহ- ১০৯০)

ইমাম আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। (জামে আত তিরমিযী, হাদীস-৪৯৮)

৩. মানুষকে ডিঙিয়ে অগ্রসর হওয়া।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً، دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . يَخْطُبُ فَجَعَلَ يَتَخَطَّى النَّاسَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ.

জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, জুমুআর দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খুতবারত অবস্থায় এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করলো। সে লোকের ঘাড় ডিঙিয়ে সামনের দিকে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি বসো, তুমি (অন্যকে) কষ্ট দিয়েছ এবং অনর্থক কাজ করেছ। (সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১১১৫)

জুমুআর দিনের অন্যান্য সুন্নত আমল হচ্ছে-

১. জুমুআর রাত থেকে নিয়ে সূর্যাস্তের পূর্বে একবার সূরা কাহফ তিলাওয়াত করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ قَرَأَ سورة الكهفِ يومَ الجمعةِ أضاءَ له مِنَ النُّورِ ما بيْنَ الجُمعتَينِ. المستدرك على الصحيحين (٦٣٤٣) صحيح الإسناد

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন সূরা কাহফ তিলাওয়াত করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য দুই জুমুআর মধ্যবর্তী সময় নূর দ্বারা আলোকোজ্জ্বল করে দিবেন।

২. দুআ কবূলের বিশেষ সময়ে আল্লাহর কাছে দুআ করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا،

জুমুআর দিন একটা সময় আছে, যে সময় বান্দা আল্লাহর কাছে যা চাইবে আল্লাহ তাআলা তাকে তা-ই দান করবেন, যদি না সে হারাম কোনো বিষয়ের প্রার্থনা করে। (সুনান ইবন মাজাহ, ১০৮৪)

সেই সময়টি কোনটি? এটা নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ মত দুইটি।

ক. আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত। কারণ হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ

জুমুআর দিনের যে মুহূর্তে (দুআ কবূল হওয়ার) আশা করা যায় তা আসরের পর হতে সূর্যাস্তের মধ্যে খোঁজ কর। (সুনান তিরমিযী, ৪৮৯)

খ. সেই মুহূর্তটি হচ্ছে, ইমাম সাহেব মিম্বরে বসার পর থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত। আবূ মূসা আল আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে জুমুআর দিনের বিশেষ মুহূর্তটি সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছ? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ

ইমামের বসা থেকে সালাত শেষ করার মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে সে মুহূর্তটি নিহিত। (সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৮৬০)

প্রথম মত ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.) গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় মত ইমাম শাফিঈ (র.) গ্রহণ করেছেন। আমাদের উচিত উভয় সময়েই দুআ এবং যিকরে মশগুল থাকা। তবে ২য় মত অনুযায়ী আমল করার সময় খুতবাহ এবং নামায চলাকালীন

সময়ে দুআ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। বরং যখন ইমাম খুতবাহ কিংবা নামাযে থাকবেন না সেই ফাঁকে ফাঁকে দুআ করে নিবেন।

৩. জুমুআর দিন বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পাঠ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ . قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ يَقُولُونَ بَلِيتَ. فَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ.

তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হল জুমুআর দিন। এদিনে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবয করা হয়েছিলো, এদিন শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি দুরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দুরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়। তখন সাহাবারা বললেন: কীভাবে আমাদের দুরূদ আপনার কাছে পেশ করা হবে? অথচ আপনি মাটির সাথে মিশে যাবেন! আউস ইবন আউস (রা.) বলেন, তারা বুঝতে চাচ্ছিলেন আপনার শরীর তো জরাজীর্ণ হয়ে মিশে যাবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ মাটির জন্য নাবী-রাসূলগণের দেহকে হারাম করে দিয়েছেন। (সুনান আবূ দাউদ, হাদীস-১০৪৭, হাদীসের মান: সহীহ)

জুমুআ বারের একটি বিশেষ দুরূদ শরীফ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়িদ ইবন ওয়াহাব (রা.) কে বলেন,

يا زيدُ ! لا تدَعْ إذا كان يومُ الجمعةِ أن تُصلِّيَ على النَّبيِّ ﷺ ألفَ مرَّةٍ: تقولُ اللَّهمَّ صَلِّ على محمَّدٍ النَّبيِّ الأمِّيِّ

হে যায়িদ! তুমি জুমুআবারে اللَّهمَّ صَلِّ على محمَّدٍ النَّبيِّ الأمِّيِّ এই দুরূদ শরীফ এক হাজার বার পাঠ করা ছেড়ে দিও না। (القول البديع (٣٨٢) في سنده لين)

৪. জুমুআবার মৃত্যুবরণের আকাঙ্ক্ষা করা। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ.

জুমুআর দিনে অথবা জুমুআর রাতে কোন মুসলমান ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে কবরের শাস্তি হতে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন। (তিরমিযী, ১০৭৪)

৫. জুমুআবারের ফজরের নামাযকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে জামাআতে আদায় করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إنَّ أفضلَ الصَّلواتِ عندَ اللَّهِ: صلاةُ الصُّبحِ يومَ الجمعةِ في جَماعةٍ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম নামায হচ্ছে জামাআতে আদায় করা জুমুআর দিনের ফজরের নামায।

أخرجه البزار (٩٧٢١)، وأبو نعيم في (حلية الأولياء) (٧/ ٧٠٢)، والبيهقي في (شعب الإيمان) (٥٤٠٣) باختلاف يسير.

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

একজন শাইখুল হাদীস

১৮ পৃষ্ঠার পর

মুহাদ্দিস ছাহেবের দারসে বুঝা যেত, তিনি কতো কিতাবের পাতা উলট-পালট করেছেন। হাদীসের সকল দিক খুব কম বাক্য ব্যয়ে আনতে তার পারদর্শীতা অনুপম অনন্য। আসমাউর রিজালের পরিচিতি পর্বে আমার মনে হতো রাবীগণ তাঁর কোনো না কোনো নিকটাত্মীয়। তিনি একজন কিতাবপ্রেমিক আলিমে দ্বীন। এটা সর্বমহলের জ্ঞাত একটি কথা। পড়ন্ত জীবনের একটি স্মৃতিচারণ করতে চাই। ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে দেওয়ানে আযীয নামীয় একটি কাব্যগ্রন্থ নিয়ে হাযির হই। যার বৃহৎ একটি অংশ আমি কাব্যানুবাদ করেছি। আমার সঙ্গে ছিল অনুবাদ এবং মূল কিতাব। তিনি আমার আবদার বুঝলেন এবং সোফায় হেলান দিয়ে বসলেন। যুহর থেকে আসর একবসায় শেষ। প্রয়োজনীয় সংশোধনী বুঝিয়ে দিলেন। অনুবাদের উপর একটি অভিমত দিলেন। তিনি বললেন আমি লিখলাম। কলম ধরার শক্তি ছিল না। আসার সময় বললেন, অভিমতে আমার নাম পরিচিতি কী দিবেন? আমি নিরুত্তর। বললেন, মো. হবিবুর রহমান, রারাই, এইটুকু-ই বেশ।

কুরআন তিলাওয়াতের আদব

মূল: হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ হামিদ আল গাযালী (র.)
অনুবাদ: ইমাদ উদ্দীন তালুকদার

কুরআন তিলাওয়াত ও কুরআনওয়ালার মর্যাদা

যাবতীয় গুণকীর্তন মহিয়ান আল্লাহ তাআলার যিনি তাঁর বান্দাদেরকে প্রেরিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কিতাব দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এই কিতাব তথা ধর্মগ্রন্থে পূর্বাপর কোনো ভ্রান্ত বিষয়কে ঠাঁই দেওয়া হয়নি। এটি শ্রেষ্ঠ ও গুণাকর বিচারক আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কিতাবের ভেতরে থাকা পূর্ববর্তী সত্য ঘটনাবলী ও সংবাদসমূহে গবেষকদের জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে। এখান থেকেই তারা সঠিক ও সুদৃঢ় পথের সন্ধান পেয়ে থাকেন, জীবন চলার পথে শান্তি ও মুক্তির দিশা পান এবং হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন। এই কিতাব হলো ইহকালীন মায়াজাল থেকে মুক্তি ও হিদায়াতের আলো। রয়েছে অন্তরের যাবতীয় অসুখের চিকিৎসা।

যে আল্লাহর রাজত্বের বৈপরীত্য করে, আল্লাহ তাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেন আর যে এই কিতাবের জ্ঞানভাণ্ডার ছেড়ে ভিন্ন কোথাও জ্ঞান আহরণ করতে চায়, আল্লাহ তাকে তার আপন ভ্রান্ততার ইচ্ছায় ছেড়ে দেন, ফলে সে বিভ্রান্ত হয়। আল-কুরআন হলো হিদায়াতের সুদৃঢ় বন্ধন; নিরাপদ আশ্রয়। কুরআন কারীম এমন মহানগ্রন্থ যা হচ্ছে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র থেকে বিশালতর বিষয়, অতি অল্প থেকে অনেক বড়- এরকম সমস্ত বিষয়াদিকে শামিল করেছে। এর বিস্ময়তা শেষ হবে না এবং অনবদ্যতারও পরিসমাপ্তি ঘটবে না। জ্ঞানীদের জন্য কুরআন থেকে জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণের পরিধি কখনই শেষ হবে না, এর অমৃত স্বাদ অবিনশ্বর, যার ক্ষয় নেই। পূর্বাপর সকলের জন্য পথপ্রদর্শক। জিনেরা যখন কুরআন শ্রবণ করে, তারা তাদের গোষ্ঠীর নিকট গিয়ে বলে,

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا– يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ
وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا

-আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি। যা সঠিক পথ প্রদর্শন করে, তাই আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং এখন আমরা আর আমাদের প্রতিপালকের সাথে (ইবাদতে) কখনও কাউকে শরীক করব না।[১]

সুতরাং যে-ই এর উপর ঈমান এনেছে, সে এ ক্ষেত্রে যথাযথই করেছে; যে কুরআন অনুযায়ী কথা বললো, সে যথার্থ বললো; যে তা আঁকড়ে ধরলো সে সত্য পথের সন্ধান পেয়ে গেল এবং যে কুরআন কারীমের নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করল, সে সফলকাম হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

-আমিই যিকর (কুরআন) নাযিল করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষণকারী।[২]

পবিত্র কুরআন অন্তর ও কাগজে হিফাযত করার আসবাব হচ্ছে তার তিলাওয়াতকে স্থায়ী করা, সর্বদা আদব ও নির্দেশনামত তা অধ্যয়ন এবং তার মাঝে নিমজ্জিত বিষয়াদির বাহ্যিক আদব ও অন্তর্নিহিত আমলসমূহের সংরক্ষণ করা। আর তার জন্য বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখা করা আবশ্যক। এ বিষয় চারটি ভাগে তুলে ধরা হবে– ১) পবিত্র কুরআনের ফযীলত ও তা লাভকারী, ২) তিলাওয়াতের বাহ্যিক আদব, ৩) তিলাওয়াতের সময় অন্তর্নিহিত আবেদন, ৪) কুরআন বুঝা ও ব্যাখ্যা।

কুরআনের ফদীলত

কুরআন ও কুরআনওয়ালাদের সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ رَأَى أَنَّ أَحَدًا أُوتِيَ أَفْضَلَ مِمَّا أُوتِيَ

فَقَدِ اسْتَصْغَرَ مَا عَظَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

-যে কুরআন পড়ে অতঃপর মনে করে অন্য কেউ আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত এই কুরআন থেকে উত্তম কিছু লাভ করেছে– সে আল্লাহ তাআলা যা মহান করেছেন, সে জিনিসকে খাটো করল।[৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَا مِنْ شَفِيعٍ أَفْضَلُ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ
الْقُرْآنِ لَا نَبِيٌّ وَلَا مَلَكٌ وَلَا غَيْرُهُ

আল্লাহর কাছে কুরআনই (তাঁর সাথে বেশি সম্পৃক্ত থাকার ফলে আমলকারীর জন্য) নবী, ফিরিশতা এবং অন্য কারোর চেয়েও বেশি সুপারিশকারী হবে।[৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَوْ كَانَ الْقُرْآنُ فِي إِهَابٍ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ

-যদি কুরআন চামড়ায় (মুড়ানো) থাকে, তাহলে (কুরআনের বিশেষত্বে সাধারণত) আগুন তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না।[৫]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

أَفْضَلُ عِبَادَةِ أُمَّتِي تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ

-আমার উম্মতের উত্তম (নফল) ইবাদাত হচ্ছে কুরআন তিলাওয়াত।[৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَرَأَ طه وَيس قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ
بِأَلْفِ عَامٍ فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ الْقُرْآن قَالَتْ
طُوبَى لِأُمَّةٍ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ هَذَا وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ
تَحْمِلُ هَذَا وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَنْطِقُ بِهَذَا

-আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিরাজিকে সৃষ্টি করার এক হাজার বছর আগে কুরআন মাজীদের

সূরা ত্বহা ও সূরা ইয়াসীন পড়েন। যখন ফিরিশতারা কুরআন শুনেন তখন তারা বলেন, সৌভাগ্য সেই উম্মতের জন্য যাদের উপর কুরআন নাযিল হবে, সৌভাগ্য তাদের যারা তা মুখস্ত করবে, সৌভাগ্য সেই জিহ্বার যেটি কুরআনকে পড়বে।[৭]

নবী করীম ﷺ আরও বলেন,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

-তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি কুরআন নিজে শিখে এবং অন্যকে শেখায়।[৮]

হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَنْ شَغَلَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَنْ دُعَائِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ ثَوَابِ الشَّاكِرِينَ

-যাকে কুরআন তিলাওয়াতের মগ্নতা তাঁর প্রয়োজন চাওয়া থেকেও বেশি মশগুল রাখে, আমি তাকে শুকুর আদায়কারীদের মধ্যে সর্বোত্তম প্রতিদান দিই।[৯]

আরেক হাদীসে এসছে, রাসূল ﷺ বলেন,

ثَلَاثَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى كَثِيبٍ مِنْ مِسْكٍ أَسْوَدَ لَا يَهُولُهُمْ فَزَعٌ وَلَا يَنَالُهُمْ حِسَابٌ حَتَّى يَفْرُغَ مَا بَيْنَ النَّاسِ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ أَمَّ بِهِ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ

-তিন ধরনের ব্যক্তি কিয়ামতের দিন মিশকের পাহাড়ের উপরে থাকবে। তারা কোনো ধরনের ভয় পাবে না এবং তাদের কোনো হিসাব হবে না। তারা হলো, ১) যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরআন তিলাওয়াত করে ২) সে ইমাম ব্যক্তি যার উপর তার মুসল্লিরা সন্তুষ্ট...।[১০]

রাসূল ﷺ আরও বলেন,

أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ

-কুরআনওয়ালারা হলো আল্লাহর ওলী তথা একান্ত নিকটবর্তী এবং তারা আল্লাহর খাস শ্রেণি।[১১]

এভাবে কুরআনের ফদীলত নিয়ে রাসূল ﷺ আরও বলেন,

إِنَّ الْقُلُوبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا جَلَاؤُهَا فَقَالَ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَذِكْرُ الْمَوْتِ

-নিশ্চয়ই কলবে জং ধরে, যেরকম লোহার মধ্যে জং ধরে। তখন বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! এর সমাধান কী? রাসূল ﷺ বলেন, তিলাওয়াতে কুরআন ও মরণের স্মরণ (কলবে জং ধরার চিকিৎসা)।[১২]

কুরআন তিলাওয়াতকারীর আল্লাহ তাআলার দয়ার দৃষ্টি নিয়ে রাসূল ﷺ আরও বলেন,

لَلَّهُ أَشَدُّ أَذَنًا إِلَى قَارِئِ الْقُرْآنِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ

-আল্লাহ তাআলা কুরআন তিলাওয়াতকারীকে কোনো ব্যক্তির পছন্দের শিল্পীর গান শুনার আগ্রহ থেকেও বেশি পছন্দের সাথে শ্রবণ করেন।[১৩]

কুরআন তিলাওয়াত ও এর মর্যাদা নিয়ে সালাফের বর্ণনা রয়েছে। সাহাবী আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা.) থেকে বলেন, কুরআন তিলাওয়াত করো। এ কিতাব কখনও ধোঁকা দিবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা সে ব্যক্তিকে আযাব দিবেন না, যে কুরআনকে হিফাযত করেছে (কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তার নির্দেশনা মেনে চলে।)।[১৪]

সাহাবী ইবন মাসঊদ (রা.) বলেন,

إِذَا أَرَدْتُمُ الْعِلْمَ فَانْثُرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

-যদি তোমরা জ্ঞান লাভ করতে চাও, তাহলে কুরআনকে বুঝো, কেননা তাতে রয়েছে পূর্বাপর সব কিছুর জ্ঞান।[১৫]

ইবন মাসঊদ (রা.) আরও বলেন,

اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّكُمْ تُؤْجَرُونَ عَلَيْهِ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ الْحَرْفُ الم وَلَكِنْ الْأَلِفُ حَرْفٌ وَاللَّامُ حَرْفٌ وَالْمِيمُ حَرْفٌ

-সকলে কুরআন তিলাওয়াত করুন, কারণ এর প্রতিটি হরফে দশটি করে নেকী রয়েছে। আমি এমনটি বলছি না যে, হরফ হচ্ছে, আলিম-লাম-মীম (তিনটি মিলে), বরং এখানে আলিফ হচ্ছে একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি অর্থাৎ প্রত্যেকটিই আলাদা হরফ।[১৬]

ইবন মাসঊদ (রা.) আরও বলেন, কাউকে কুরআন ছাড়া ভিন্ন কিছু নিয়ে যেন প্রশ্ন না করা হয়, কারণ যদি কেউ কুরআনকে ভালোবাসে এবং কুরআন তাকে বিমোহিত করে, তাহলে এটাই বুঝায় সে আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺকে ভালোবাসে; আর যদি সে কুরআনের প্রতি ঘৃণা রাখে তাহলে এর মানে সে আল্লাহ এবং তার রাসূল ﷺ কেই ঘৃণা করে।[১৭] সাহাবী আমর ইবনল আস (রা.) বলেন, 'কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াতের বিনিময়ে জান্নাতে একেকটি মর্যাদার স্তর রয়েছে এবং একেকটি আয়াত তোমাদের ঘরের জন্য একেকটি আলোকবর্তিকা।'[১৮] এই সাহাবী কুরআনের ব্যাপারে আরও বলেন, যে কুরআন পড়ে সে যেন তার উভয় পাশে ধীরে ধীরে নবুওয়াতের নূর অনুভব করছে। তবে তার কাছে ওহী আসবে না।[১৯]

সাহাবী আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, 'যে ঘরে কুরআন তিলাওয়াত হয়, সে ঘরে বরকত বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাদের কল্যাণ বৃদ্ধি পায়, ফিরিশতারা তিলাওয়াত শুনতে আসেন এবং সে ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায়। আর যে ঘরে আল্লাহর এই কিতাব তিলাওয়াত হয় না, আল্লাহ তাআলা সবকিছু সংকীর্ণ করে দেন, কল্যাণ হ্রাস পায়, ফিরিশতারা বের হয়ে যান এবং শয়তান প্রবেশ করে।'[২০]

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.) বলেন, 'আমি স্বপ্নে আল্লাহর দীদার লাভ করি। তখন আমি বলি, হে রব! কী সবচেয়ে উত্তম জিনিস, যার মাধ্যমে আপনার নৈকট্যলাভকারীরা আপনার নৈকট্য লাভ করে। আল্লাহ বলেন, আমার কালামের মাধ্যমে। তখন আমি বলি, হে আমার রব, আপনার কালাম বুঝে পড়ার মাধ্যমে না, না বুঝে পড়ে? আল্লাহ তাআলা বলেন, বুঝে পড়ে এবং না বুঝে কেবল তিলাওয়াতের মাধ্যমেই (আমার নৈকট্য হাসিল করতে পারে)।[২১] বিশিষ্ট তাবিঈ ইমাম মুহাম্মদ ইবন কাব আল-কুরজী (র.) বলেন, যখন মানুষ কিয়ামত দিবসে আল্লাহর কাছ থেকে কুরআন তেলাওয়াত শুনবে, মানুষ (এই তিলাওয়াতের এমন অমীয় স্বাদ পাবে) মনে করবে তারা কখনোই এই কুরআন আর শুনে নাই।'[২২] ইমাম ফুদাইল ইবন ইয়াদ আবিদুল হারামাইন (র.) বলেন, কুরআনকে ধারণকারী ব্যক্তির অনুচিত তার কোনো প্রয়োজনে দুনিয়ার কারো কাছে যাওয়া হউক সে খলিফা বা তার চেয়ে নিম্ন মর্যাদার কেউ। বরং মানুষের তার কছে জড়ো হওয়া উচিত।'[২৩] তিনি আরও বলেন, কুরআনকে ধারণকারী হলো ইসলামের পতাকাবাহী। সুতরাং তার উচিত নয় যে খামখেয়ালিপনা করে তার মত খামখেয়ালি করা, যে কুরআন ভুল পড়ে তার উচিত নয় তার মত ভুল পড়া, যে কুরআন পড়ে ভুলে যায় তার জন্য উচিত নয় সেরকম ভুলে যাওয়া।' তিনি আরও বলেন, এরকম করা হচ্ছে কুরআনকে তাযীম করার জন্য।[২৪] ইমাম সুফইয়ান সাওরী (র.) বলেন, ব্যক্তি যখন কুরআন তিলাওয়াত করে, ফিরিশতারা তার দু চোখের মাঝে চুম্বন করেন।[২৫] বিশিষ্ট তাবিঈ আমর ইবন মাইমুন (র.) বলেন, ফজরের নামায শেষে যে

একশত কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে আল্লাহ তাকে দুনিয়ার সমস্ত অধিবাসীর সাওয়াব প্রদান করেন।

বর্ণিত আছে, খালিদ ইবন উকবা (রা.) রাসূল ﷺ এর কাছে আসলেন। রাসূল ﷺকে বললেন, আমাকে কুরআন শুনান। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন শুনালেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

-নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, দয়া এবং নিকটাত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন (আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পড়ুন)... ।[২৬]

তিনি বলেন, এই আয়াতটি আবার পড়ুন। রাসূল ﷺ আবার পড়েন। এই কথা শুনে তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! এই বাণীতো অত্যন্ত সুস্বাদু। এটাতো উর্ধ্বতর, নিম্নতর সমস্ত বিষয় সমেত নির্দেশনার পত্র। এই বাণী অনেক উচ্চাঙ্গের বাণী, এটি মানবরচিত রচনা নয়।[২৭]

ইমাম হাসান বাসরী (র.) বলেন, কুরআন ধরে রাখার সম্পদের উপর কোনো সম্পদ নেই আর কুরআনহীনতার দারিদ্রতার চেয়ে দারিদ্রতা নেই।[২৮]

হযরত ফুদাইল ইবন ইয়াদ (র.) বলেন, 'যে সকালে সূরা হাশরের শেষ অংশ পড়ে, অতপর সে দিনই মারা যায়, সে শহীদের মর্যাদা পাবে। আর যে সন্ধ্যায় তা পড়ে অতপর সে রাতেই মারা যায় সেও শহীদের মর্যাদা পাবে।[২৯] কাসিম ইবন আব্দুর রহমান (র.) বলেন, আমি এক বুযুর্গকে জিজ্ঞেস করলাম, এমন কোনো বন্ধু আছে, যার সাথে বন্ধুত্ব করা যায়? তখন সেই বুযুর্গ হাত প্রসারিত করে কুরআনের মাসহাফ দেখালেন এবং তা বুকে জড়িয়ে বললেন, এটি (অর্থাৎ এটি সে, যার সাথে বন্ধুত্ব করা যায়।)।[৩০]

হযরত আলী ইবন আবী তালিব (রা.) বলেন, তিনটি স্মৃতিশক্তি বাড়ায়, শ্লেষ্মা দুর করে, ১) মিসওয়াক, ২) রোযা এবং ৩) কুরআন তিলাওয়াত।[৩১] ▪

সূত্র:
ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহ'র কালজয়ী 'ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন' কিতাবের 'আদাবু তিলাওয়াতিল কুরআন' অধ্যায়ের 'ফাদীলাতুল কুরআন' পাঠের অনুবাদপাঠের অনুবাদ।

---

[১] সূরা জিন, আয়াত: ১-২

[২] সূরা হিজর, আয়াত: ৯

[৩] ইমাম তাবারানী (র.) হাদীসটি কিছুটা ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন,

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَكَأَنَّمَا اسْتُدْرِجَتِ النُّبُوَّةُ بَيْنَ جَنْبَيْهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوحَى إِلَيْهِ ومَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَرَأَى أَنَّ أَحَدًا أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِيَ، فَقَدْ عَظَّمَ مَا صَغَّرَ اللهُ، وصَغَّرَ مَا عظَّمَ اللهُ، ولَيْسَ يَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَسْفَهَ فِيمَنْ يَسْفَهُ، أَوْ يَغْضَبَ فِيمَنْ يَغْضَبُ، أَوْ يَحْتَدَّ فِيمَنْ يَحْتَدُّ، ولَكِنْ يَعْفُو ويَصْفَحُ؛ لِفَضْلِ الْقُرْآنِ

-আল-মুজামুল কাবীর, হাদীস-১৪৫৭৫

[৪] আল্লামা ইবনুস সুবকী (র.) তাখরীজে বর্ণনাটিকে সনদহীন বলেছেন। তবে কুরআনের সুপারিশের সমর্থনে অন্যান্য বর্ণনা রয়েছে। ইমাম মুসলিম (র.) কুরআন ধারণকারী ব্যক্তির জন্য কুরআন শাফাআতকারী হবে সংক্রান্ত বর্ণনা করেন, اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِصَاحِبِهِ -মুসলিম: ৮০৪

[৫] ইমাম তাবারানী (র.), আল-মুজামুল কাবীর, হাদীস-৪৯৮; ইমাম আলী ইবন আবূ বকর হাইসামী (র.), মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়াইদ, হাদীস-১১৬২৭

[৬] আল্লামা মুত্তাকী আল-হিন্দী রাহিমাহুল্লাহু, কানযুল উম্মাল, হাদীস-২৩৫৯

[৭] ইমাম দারিমী, সুনান দারিমী, হাদীস-৩৪১৪; ইমাম তাবারানী (র.), আল-মুজামুল কাবীর, হাদীস-৪৮৭৩

[৮] ইমাম বুখারী, সহীহ বুখারী, হাদীস-৪৭৮৯

[৯] ইমাম তিরমিযী (র.), সুনান তিরমিযী, হাদীস-২৯২৬

[১০] ইমাম তিরমিযী (র.), সুনান তিরমিযী, হাদীস-১৯৮৬

[১১] ইমাম ইবন মাজাহ, সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-২১৫

[১২] ইমাম বাইহাকী (র.), শুআবুল ঈমান, হাদীস-১৮৫৯

[১৩] ইমাম ইবন মাজাহ, সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১৩৪০

[১৪] ইমাম দারিমী (র.), সুনান দারেমী, হাদীস-৩৩২০

[১৫] ইমাম আবূ তালিব মাক্কী (র.) (৩৮৬ হি.), কূতুল কুলূব ফি মুআমালাতিল মাহবুব, ১/৯০

[১৬] ইমাম তিরমিযী, সুনান তিরমিযী, হাদীস-২৯১০

[১৭] ইমাম আবূ তালিব মাক্কী (র.) (৩৮৬ হি.), কূতুল কুলূব ফি মুআমালাতিল মাহবুব, ২/৮৮ (শামেলা)

[১৮] ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র.), কিতাবুয যুহদ ও ওয়ার রাকায়েক, হাদীস-৭৮৯

[১৯] ইমাম তাবারানী (র.), আল-মুজামুল কাবীর, হাদীস: ১৪৫৭৫; ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী রাহিমাহুল্লাহ (৪০৬ হি.), আল-মুসতাদরাক আলাস সাহীহাইন, হাদীস-২০২৮

[২০] ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র.), কিতাবুয যুহদ ও ওয়ার রাকায়েক, হাদীস-৭৯০; ইমাম ইবনু আবী শাইবা (র.), আল-মুসান্নাফ: ৩০০২৭

[২১] ইমাম ইবনুল জাওযী (র.), মানাকিবুল ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ৫৮৩-৪ (শামিলা)

[২২] ইমাম আবূ নুয়াইম (র.) (৪৩০ হি.), সিফাতুল জান্নাত, হাদীস-২৭০

[২৩] ইমাম আবূ নুয়াইম (র.) (৪৩০ হি.), হিলইয়াতুল আউলিয়া ৮/৯২

[২৪] ইমাম আবূ নুআইম (র.) (৪৩০ হি.), প্রাগুক্ত হিলইয়াতুল আউলিয়া ৮/৯২

[২৫] ইমাম বাইহাকী (র.), শুআবুল ঈমান, হাদীস নং-২০৭৪

[২৬] সূরা নাহল, আয়াত: ৯০

[২৭] ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী (র.) (৪০৬ হি.), আল-মুসতাদরাক আলাস সাহীহাইন, হাদীস-৩৮৭২

[২৮] ইমাম ইবন শাইবা রাহিমাহুল্লাহু, আল-মুসান্নাফ, হাদীস-২৯৯৫৪

[২৯] ইমাম আবূ মুহাম্মাদ দারিমী (র.), মুসনাদে দারেমী, হাদীস-৩৪৬৬

[৩০] ইমাম ইবন আবিদ দুনিয়া, আল-আযলাতু ওয়াল ইনফিরাদ, হাদীস-৫৩

[৩১] ইমাম দাইলামী (র.), মুসনাদুল আল-ফিরদাউস, হাদীস-২৯৮০

রঙ হোক আপনাদের
ভালোবাসার, ভালো লাগার
মুদ্রণ ও শৈল্পিক কাজের
শিল্পবন্ধু

রঙ প্রিন্টার্স
সৃষ্টিতে শৈল্পিক কারুকাজ

০১৭৪২ ৬২৭৮৭৯
০১৭৬৪ ০৩৬২৯০

rangprinter@gmail.com
rangprintersbd@gmail.com

৩১৭, রংমহল টাওয়ার (৩য় তলা)
বন্দরবাজার, সিলেট

তুফান শেষে গাযায় প্রত্যাবর্তন

মুহাম্মাদ বিন নূর

সোয়া এক বছর যে প্রবন্ধ লেখার অপেক্ষায় ছিলাম, অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এলো। ফিলিস্তিনের ইতিহাসের দীর্ঘ ও নৃশংসতম যুদ্ধ শেষে গাযায় যুদ্ধবিরতি শুরু হয়েছে। চিরস্থায়ী না হোক, অন্তত আগের বিরতির চেয়ে কিছুটা হলেও যে দীর্ঘস্থায়ী, তা মোটামুটি নিশ্চিত। বলা চলে প্রতিরোধযোদ্ধাদের এই পর্যায়ের আল আকসার তুফান শেষ হলো, যদিও যুদ্ধ যে শেষ হয়নি তা ফিলিস্তিনীদের অজানা নয়। তবে গাযাবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে সোয়া এক বছর পর। গাযায় ফিরে তারা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে খুঁজছে প্রিয়জনের লাশ, যারা কি না শহীদ হয়েছিলেন আগ্রাসি দখলদার বাহিনীর নির্বিচার নৃশংস আক্রমণে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর শুরু হওয়া এই যুদ্ধ কীভাবে ট্রাম্পের হস্তক্ষেপে থামানো সম্ভব হলো, তার ফলে কার বিজয় হলো আর কোন পক্ষের অর্জনই বা কী, এসব নিয়েই এই প্রবন্ধে কিছুটা আলোকপাত করা হবে।

ফিরে দেখা প্রলয়ংকরী তুফান

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর প্রথম বারের মতো দখলদার ইসরায়েল রাষ্ট্রের নিজস্ব ভূখণ্ডে দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করে হামাস ও তাদের সহযোগী অন্যান্য প্রতিরোধযোদ্ধারা। আপাত দৃষ্টিতে আত্মঘাতী এই অভিযানের পিছনে হামাস যোদ্ধারা যে কয়েকটি উদ্দেশ্যের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন, তার মধ্যে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সাথে ইসরায়েলের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণকে থামিয়ে দেওয়া, ইসরায়েলী বন্দিদের আটক করে বন্দিবিনিময় চুক্তির মাধ্যমে ফিলিস্তিনী বন্দিদের মুক্তি নিশ্চিত করা, সর্বোপরি ইসরায়েলী সামরিক বাহিনীর মনোবলে চূড়ান্ত ধাক্কা দিয়ে তাদের সামরিক সক্ষমতা এবং গোয়েন্দা সক্ষমতার মিথ্যা অহমিকাকে ধুলিস্যাৎ করা। অন্যদিকে সাত অক্টোবরের পর ইসরায়েল যে পাল্টা হামলা চালায়, তার পিছনে তাদের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল- কোন ধরনের সমঝোতা চুক্তি ছাড়া সামরিক বল প্রয়োগ করে বন্দিদের উদ্ধার করা, হামাসের সামরিক সক্ষমতা ধ্বংস করা, যুদ্ধের পর যাতে গাযায় হামাসের শাসন বহাল না থাকে তা নিশ্চিত করা, গাযা যেন আর কখনো ইসরায়েলের 'নিরাপত্তা ঝুঁকি' হয়ে না উঠে তা নিশ্চিত করা। সোয়া এক বছর ধরে চলমান সেই নৃশংস ইসরায়েলী বর্বরতা এবং তার বিরুদ্ধে গাযাবাসীর অটল-অবিচল অবস্থান যুদ্ধ শেষে অজস্র ক্ষতি সত্ত্বেও গাযাবাসীই বিজয়ের হাসি হেসেছে, ইসরায়েলী গণমাধ্যম যেখানে পরাজয়ের গ্লানি টানছে । একথা সত্যি, গাযায় প্রতিরোধযোদ্ধাদের কোনো সুখকর বিজয় অর্জিত হয়নি, তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য তথা স্বাধীন ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও ইয়াহুদী দখলদারদের উচ্ছেদ সম্ভব হয়নি, বরং ইসমাঈল হানিয়া, ইয়াহইয়া সিনওয়ারের মতো কিংবদন্তিতুল্য নেতৃত্বসহ অসংখ্য শীর্ষস্থানীয় নেতাদেরকে হারাতে হয়েছে, হারাতে হয়েছে অন্তত অর্ধলক্ষাধিক বেসামরিক মানুষকে, ধ্বংস হয়েছে পুরো গাযার অবকাঠামো। এতো চওড়া মূল্যের বিনিময়ে যা অর্জিত হয়েছে, তা আদৌ যথেষ্ট কি না, ফিলিস্তিনী স্বাধীনতাকামীদের মনে সে প্রশ্ন থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়। তবু সমরবিদ্যার চোখে যদি কৌশলগত ফলাফল আলোচনা করতে হয়, তাহলে ইসরায়েলের তুলনায় ফিলিস্তিনীদের অর্জনের পাল্লাই ভারি বলে মনে হবে।

এখন কেন চুক্তি

সাতই অক্টোবরের পর থেকেই যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। বারবার হামাসের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া মিললেও সাড়া মিলেনি অপরপক্ষের। ফলে সাময়িক যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে হাতে গোনা কিছু বন্দি বিনিময় হলেও তুলনামূলক দীর্ঘস্থায়ী কোন চুক্তি সম্ভব হয়নি। সর্বশেষ গত বছর মে মাসের দিকে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন 'ইসরায়েলীদের' পক্ষ থেকে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি প্রস্তাব করেন, কিন্তু হামাস সম্মত হওয়ার সাথে সাথেই সেই চুক্তি থেকে পিছিয়ে আসে বর্বর নেতানিয়াহু সরকার। বিশ্লেষকদের ভাষ্যমতে সেই প্রস্তাবিত চুক্তির সাথে পঁচিশের জানুয়ারিতে স্বাক্ষরিত চুক্তির মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই, বলা চলে দুটোই আসলে একই চুক্তি। প্রশ্ন হলো– তাহলে মে মাসে যে চুক্তি সম্ভব হয়নি, সেটিই পরের জানুয়ারিতে এসে কীভাবে সম্ভব হলো? এক্ষেত্রে অনেকগুলো কারণ বিবেচনায় রাখা যেতে পারে। প্রথমত, হামাসের হাতে থাকা যুদ্ধবন্দিদের পরিবার থেকে নেতানিয়াহু সরকারের উপর চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তার সাথে বাইরে থেকে যুক্ত হয়েছে মার্কিন প্রশাসনে পরিবর্তন। ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনে জিতেই বলেছিলেন, তিনি দায়িত্বগ্রহণের আগেই সকল ইসরায়েলী বন্দির মুক্তি দেখতে চান। শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব না হলেও দায়িত্বগ্রহণের আগেই তার বিশেষ দূতের চাপে ইসরায়েলকে অন্তত একটি দীর্ঘস্থায়ী চুক্তিতে সম্মত করা গিয়েছে। কিন্তু কেন ট্রাম্পের চাপে কাজ হলো, বাইডেন যেখানে এই চুক্তির ব্যর্থতার কারণে (আরো অনেক কারণ থাকলেও এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল) নির্বাচনেই হেরে গেলেন? এক্ষেত্রে অনেকেগুলো কারণ রয়েছে। প্রথমত বাইডেন ছিলেন আদর্শিকভাবে কট্টর জায়োনিস্ট, ফলে তার পক্ষে ইসরায়েল সরকারের উপর অধিক চাপ প্রয়োগ করা কঠিন ছিল, যেখানে ট্রাম্প ইসরায়েল সমর্থক হলেও জায়োনবাদ নিয়ে তার বিশেষ কোন মাথাব্যথা নেই, তিনি যা করতে চান, তাই করেন। দ্বিতীয়ত ইসরায়েলে আভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারণে নেতানিয়াহুর পক্ষে বাইডেনের চাপে চুক্তিতে আসার তুলনায় ট্রাম্পের চাপে চুক্তিতে আসা সহজ, কারণ ট্রাম্প ইসরায়েলকে যত ধরনের সুবিধা দিবেন বলে তার অতীত রেকর্ড বিবেচনায় আশা করা যায়, কট্টর জায়োনিস্ট বাইডেনের দিক থেকে ততটা আশা করার সুযোগ খুব একটা নেই, যেহেতু দিনশেষে বাইডেন ডেমক্রেট প্রেসিডেন্ট। তাছাড়া ট্রাম্প প্রশাসনে কট্টর ইসরায়েলপন্থীদের আধিক্যও ইসরায়েলের জন্য তার উপর ভরসা করা সহজ করে দিয়েছে। তৃতীয়ত ট্রাম্পের নির্দেশে আপাতত যুদ্ধবিরতিতে সম্মত না হলে মার্কিন সহযোগিতা বন্ধের ভয় আছে, বাইডেনের দিক থেকে

যে ভয় ছিল না। তদুপরি ট্রাম্প ইসরায়েলকে বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েই এই চুক্তিতে রাজি করিয়েছেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

চুক্তির স্থায়িত্ব

কাগজে তিন দফায় এ চুক্তি বাস্তবায়ন হওয়ার কথা, প্রথম পর্যায়ে হামাস তেত্রিশজন ইসরায়েলীকে (অধিকাংশই শিশু এবং মহিলা) মুক্তি দেবে, বিনিময়ে ইসরায়েল প্রতি ইসরায়েলী মুক্তির জন্য ৩০-৫০ জন ফিলিস্তিনীকে (শিশু ও মহিলাদের দিয়ে শুরু) মুক্তি দেবে। এই পর্যায়ে, ইসরায়েলকে ‘পর্যাপ্ত’ পরিমাণে মানবিক সাহায্যের অনুমতি দিতে হবে, বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনীদের তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে দিতে হবে এবং গাযা থেকে পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার শুরু করতে হবে। ইতিমধ্যে এই পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান। নির্দিষ্ট সংখ্যক বন্দিবিনিময় হচ্ছে, বিভিন্ন দেশ থেকে মানবিক সহায়তা গাযায় পৌঁছাচ্ছে, গাযাবাসী নিজেদের ধ্বংসস্তূপে ফিরছে। প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধবিরতি চলাকালে যুদ্ধবিগ্রহ স্থায়ীভাবে বন্ধ করার জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা শুরু হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, ইসরায়েল একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতি মেনে নেবে এবং হামাস তখন ফিলিস্তিনী বন্দিদের বিনিময়ের জন্য অবশিষ্ট জীবিত পুরুষ জিম্মি, বেসামরিক এবং সৈন্য উভয়কেই মুক্তি দেবে। তৃতীয় পর্যায়ে, নিহত ইসরায়েলী জিম্মিদের দেহাবশেষ ফেরত দেওয়া হবে। অপরদিকে গাযায় পুনঃনির্মাণ শুরু হবে এই পর্যায়ে। এই চুক্তির প্রথম দফা বাস্তবায়নে খুব একটা আশঙ্কা না থাকলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের চুক্তি বাস্তবায়ন আদৌ সম্ভব হবে কি না সে আশঙ্কা থেকেই যায়। নেতানিয়াহুর কট্টরপন্থী সমর্থকদের নিয়ে সরকার টেকাতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের শর্তগুলো বড় ধরনের বাধার মুখোমুখি হতে পারে বলে মনে হচ্ছে। যদিও নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট পুনরায় যুদ্ধ শুরুর পক্ষে সায় দেওয়ার সম্ভাবনা কম, সেক্ষেত্রে যুদ্ধবিরতি কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে বলে আশা করা যায়।

জয়-পরাজয়

যুদ্ধ শেষে জয়-পরাজয়ের আলোচনা নিঃসন্দেহে গুরুত্ব রাখে। কিন্তু এবারের যুদ্ধ শেষে আসলে এই আলোচনার সুযোগ তুলনামূলক কম, তার কারণ ফিলিস্তিনীদের যে সুদীর্ঘ স্বাধীনতার সংগ্রাম– তা এই যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে শেষ হয়ে যায়নি। ফলে দীর্ঘ যুদ্ধের একটি পর্যায় শেষে বিরতি চলছে মাত্র, তাতে চূড়ান্ত জয়-পরাজয়ের আলোচনা করা কঠিন। তবু কেউ যদি শুধু হতাহতের সংখ্যা দিয়ে জয়-পরাজয় নির্ধারণ করতে চান, তবে মনে হতে পারে ইসরায়েলীদের বিজয় অর্জিত হয়েছে, ফিলিস্তিনীরা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কিন্তু সমরবিদ্যায় যুদ্ধের ফলাফল তো কেবল হতাহতের সংখ্যা দিয়ে বিচার করা হয় না, তার আরো বহু মাপকাঠি রয়েছে। গত সোয়া এক বছর ধরে মাসিক পরওয়ানায় আমরা বিভিন্ন সময় আলোচনা করেছি, এরকম যুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক সেনাবাহিনী যদি চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না, তবে সেটা তাদের পরাজয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে, অন্যদিকে প্রতিরোধযোদ্ধারা যদি কেবল নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হন তাহলেই সেটাকে তাদের বিজয় বলে বিবেচনা করা হয়। যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়নের প্রথম দিন থেকেই হামাস ও অন্যান্য প্রতিরোধযোদ্ধারা যেভাবে প্রকাশ্যে সামরিক পোশাকে মহড়া দিচ্ছেন আর গাযার জনসাধারণ যেভাবে তাদেরকে অভিবাদন জানাচ্ছে, তাতে এ কথা বলতে দ্বিধা নেই প্রতিরোধযোদ্ধারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন, তাদের নিঃশেষ করতে ইসরায়েল ব্যর্থ হয়েছে। যা প্রকারান্তরে সংগ্রামের এই পর্যায়ে ইসরায়েলের পরাজয় ও প্রতিরোধযোদ্ধাদের বিজয় বলে বিবেচিত হবে।

তাত্ত্বিক বিচারে এক্ষেত্রে কয়েকটি মানদণ্ডে বিজয় অর্জিত হয়েছে প্রতিরোধযোদ্ধাদের; তারা নিজেদের সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি বহাল রেখে যুদ্ধ শেষ করেছেন, যদিও বা বড় ধরনের ক্ষতির শিকার হতে হয়েছে কিন্তু আত্মসমর্পণ না করেই তারা চুক্তিতে আসতে সক্ষম হয়েছেন, শত্রু পক্ষের মনোবলে বড় ধরনের আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছেন, তাদের নির্ধারিত লক্ষ্য অনুসারে বন্দিবিনিময় চুক্তিতে ইসরায়েলকে বাধ্য করতে সক্ষম হয়েছেন, গাযাবাসী তাদের সাথেই গাযায় থেকে গেছেন এবং যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরপর ধ্বংসপ্রাপ্ত উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের বাড়িঘরের ধ্বংসস্তূপে ফিরে নিজেদের অবিচলতার প্রমাণ রেখেছেন বরাবরের মতো । অন্যদিকে ইসরায়েলীদের ঘোষিত কোন লক্ষ্যই বাস্তবায়ন হয়নি, কেননা বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা তো আর ঘোষিত লক্ষ্য ছিলো না, ঘোষিত লক্ষ্য ছিল গাযাকে ফিলিস্তিনী মুক্ত করা, হামাসকে সামরিকভাবে ধ্বংস করা, সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে বন্দিদের ফিরিয়ে আনা, যুদ্ধ শেষে গাযাবাসীকে গাযা থেকে সরানো সম্ভব না হলে অন্ততপক্ষে হামাসের শাসনের অবসান ঘটানো। হামাসের শীর্ষনেতাদের হত্যা করেও ঘোষিত লক্ষ্যসমূহের একটিও বাস্তবায়ন করতে পারেনি ইসরায়েলী দখলদার বাহিনী, হামাস গাযার মাটিতে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে এখনো। ফলে সুখকর কোন বিজয় অর্জিত না হলেও প্রতিরোধযোদ্ধারা ইসরায়েলী বাহিনীর প্রতিটি লক্ষ্যকে ব্যর্থ করে নিজেদের সাময়িক বিজয় নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছেন, যার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত বিজয়ের পথে তারা আরো এক ধাপ এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। পরাজয়ের সুর তাই ইসরায়েলীদের কথাবার্তার মধ্যেও স্পষ্ট।

পরবর্তী শঙ্কা ও সম্ভাবনা

নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট যুদ্ধের পিছনে ব্যয় করতে খুব আগ্রহী না হলেও ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের সব চাহিদা পূর্ণ করতে তার আন্তরিকতার কোন কমতি নেই। বলা হয়ে থাকে, যুক্তরাষ্ট্রের ডেমক্রেটরা ইসরায়েলের প্রেমিক, অন্যদিকে রিপাবলিকানরা ইসরায়েলের উপাসক। ট্রাম্পের প্রশাসনে ইসরায়েলের উপাসকদেরই জয়জয়কার। এর আগের আমলে ট্রাম্প অভিশপ্ত ‘শতাব্দীর চুক্তি’ ঘোষণা করেছিলেন, যার মাধ্যমে চিরতরে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বপ্নকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে সেবারের মতো ব্যর্থ হয়েছিলেন, জেরুযালেমে মার্কিন দূতাবাস স্থানান্তর করে জেরুযালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, ফিলিস্তিনী রাষ্ট্রের দাবিকে পাশ কাটিয়ে কয়েকটি আরব রাষ্ট্রের সাথে ইসরায়েলের সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছিলেন। এবার নির্বাচিত হয়ে ইতোমধ্যে ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন গাযাবাসীকে মিসর ও জর্দানে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা, আবাসন ব্যবসায়ীর চোখে গাযার সৌন্দর্যও বর্ণনা করেছেন। সামনের দিনগুলোতে ট্রাম্প মিসর ও জর্দানের উপর চাপ প্রয়োগ করে ফিলিস্তিনীদের সেসব দেশে স্থানান্তরিত করে ভূমি ইসরায়েলের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করবেন, পশ্চিম তীরে অবৈধ ইসরায়েলী বসতিসমূহের বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, স্বাধীন ফিলিস্তিনী রাষ্ট্রের সব ধরনের সম্ভাবনাকে হত্যা করে মধ্যপ্রাচ্যে কথিত ‘শান্তি’ প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাবেন, এসব ভবিষ্যদ্বাণী করতে কোন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই আসলে। প্রাথমিকভাবে মিসর এবং জর্দান ট্রাম্পের প্রস্তাব খারিজ করে দিলেও শেষ পর্যন্ত ট্রাম্পের কূটনৈতিক রীতিবহির্ভূত একগুয়ে চাপের মুখে কতদিন টিকে থাকতে পারবে, তা সময়ই বলে দেবে। এক্ষেত্রে অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকা কী হবে, তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ট্রাম্প বিনা যুদ্ধে ইসরায়েলের চাহিদা বাস্তবায়নের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা বজায় রাখবেন, তা বলাই বাহুল্য। তবে গাযাবাসী যে অবিচল অবস্থান দেখিয়ে যাচ্ছে এখন অবধি, তাতে যে কোন পরিস্থিতিতে প্রতিরোধযোদ্ধাদের জন্য গাযা রক্ষা অনেক সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে। যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়নের পরপর গাযাবাসী যেভাবে গাযা উপত্যকার উত্তরাঞ্চলে নিজেদের বাড়িঘরের ধ্বংসস্তূপে ফিরে গিয়েছেন একযোগে, তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। বাড়িঘর দূরে থাক, পানি কিংবা বিদ্যুতও নেই, নেই কোন খাবার-দাবারের নিশ্চয়তা— এমনটা নিশ্চিত জেনেও গাযাবাসী যেভাবে উত্তরাঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তা ইসরায়েলীদেরকেও হতবাক করেছে। ইসরায়েল যুদ্ধ চলাকালে এই অঞ্চলে অবৈধ বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছিল, এমনকি আগ্রহীদের নাম নিবন্ধনের প্রক্রিয়াও শুরু করেছিল, তারা কল্পনাও করেনি এভাবে গাযাবাসী ফিরে আসবে। উত্তর গাযার তুলনায় কোন ধরনের ক্ষয়ক্ষতি না হওয়া সত্ত্বেও সীমান্তবর্তী ইসরায়েলীরা এখনো ফিরে আসছে না, সেখানে সব হারানো ফিলিস্তিনীরা নিরাপদ আশ্রয়ের চিন্তা না করে ফিরে আসছেন নিজেদের ভূমিতে। ইসরায়েলী গণমাধ্যম প্রত্যাবর্তনের এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখিয়ে দাবি করছে এরা সকলেই হামাস কিংবা হামাস সমর্থক; যদিওবা ভিডিওতে নারী-শিশুসহ নানা বয়সের মানুষকে স্বতস্ফূর্তভাবে ফিরতে দেখা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে এক কথায় বলা চলে গাযা তথা ফিলিস্তিন নিয়ে শঙ্কার বিষয় হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলোর গাদ্দারী, আর আশার আলো দেখাচ্ছে নির্ভীক গাযাবাসী।

এই মাসে এই চাঁদে

পরওয়ানা ডেস্ক:

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর জন্ম, নাম ও বংশধারা

নুমান ইবন সাবিত ইবন যুত্বা ইবন মারযুবান। উপনাম আবূ হানীফা। এ নামেই তিনি অত্যধিক পরিচিত ছিলেন। উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের রাজত্বকালে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইরাকের কূফা নগরীতে ৫ সেপ্টেম্বর ৬৯৯ খ্রিস্টাব্দ, ৪ শাবান ৮০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফিকহশাস্ত্রের একজন প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ ইমাম এবং হিজরী প্রথম শতাব্দীর একজন মুজতাহিদ। পৃথিবীর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও পরিচিত চারটি মাযহাবের অন্যতম হানাফী মাযহাব তাঁর নামেই প্রতিষ্ঠিত। ষোল বছর বয়সে তিনি পিতার সাথে হজ্জে গিয়েছিলেন। তাঁর পিতা সাবিত বিন যুত্বা আফগানিস্তানের একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। বংশধরের দিক থেকে তাকে অনারবীয় বলে ধারণা করা হয়। প্রখ্যাত মুসলিম ইতিহাসবিদ খতীব বাগদাদী আবূ হানীফার নাতি ইসমাঈল বিন হাম্মাদের বক্তব্য থেকে আবূ হানীফার বংশ ব্যাখ্যা দেন। আরেক ইতিহাসবিদ হামাদ আবূ হানীফাকে পারসিক বংশোদ্ভূত বলে দাবি করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর বংশ নিয়ে অনেক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তবে সবচেয়ে বেশি পরিচিত ও নির্ভরযোগ্য মত হলো তিনি কাবূলের পারসিক বংশোদ্ভূত।

হাদীস শাস্ত্রে অবদান

ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীস শাস্ত্রে অতুলনীয় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রায় চার হাজার শাইখ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন। ইমাম বুখারীর অন্যতম উস্তায মক্কী বিন ইবরাহীম (র.) যাঁর সনদে ইমাম বুখারী (র.) বেশিরভাগ সুলাসিয়াত হাদীস বর্ণনা করেছেন। মক্কী বিন ইবরাহীম ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর ছাত্র। তিনি আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) তার সময়ের শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। আবিদ ইবন সালিহ বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীসের নাসিখ ও মানসুখ নির্ণয়ের ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিলেন। তার শহরে যেসব হাদীস পৌঁছেছে তার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর তিরোধানের সময়কার সর্বশেষ আমল কী ছিল সেসব তার মুখস্থ ছিল।

ফিকহ শাস্ত্রের আবিষ্কারক:

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ফিকহ শাস্ত্রের আবিষ্কারক ছিলেন। ফিকহ, ইসলামী আইন সংকলন ও সম্পাদনার জন্য তিনি ৪০ জন ফকীহ নিয়ে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। ওই যুগে যেসব মাসআলা মাসাইল সংকলন হয়েছিল, তার সংখ্যা ১২ লাখ ৭০ হাজারের ঊর্ধ্বে। ফিকহ শাস্ত্রে তার অবদানের ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, ফিকহ শাস্ত্রের সব মানুষ ছিলেন আবূ হানীফা (র.) এর পরিবারভুক্ত। ইমাম মালিক (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এমন এক ব্যক্তি তিনি যদি ইচ্ছা করেন এই স্তম্ভটিকে সোনা প্রমাণিত করবেন, তবে নিঃসন্দেহে তিনি তা প্রমাণ করতে সক্ষম। (জামিউ বায়ানিল ইলম)

কাযীর পদ প্রত্যাখান

আব্বাসীয় বংশের খলীফা আল মানসূর ইমাম আবূ হানীফা (র.) কে রাজ্যের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখান করেন। প্রস্তাব প্রত্যাখানের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) আবূ ইউসুফ আল মানসূরকে ব্যাখা দেন যে, আমি নিজেকে এই পদের জন্য উপযুক্ত মনে করি না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রস্তাব প্রত্যাখান করার পর মানসূর তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে অভিযুক্ত করেন। এই অভিযোগ শুনে আবূ হানীফা (র.) বলেন, যদি আমি মিথ্যাবাদী হই তাহলে তো প্রস্তাব প্রত্যাখান করার ব্যাপারে আমার মতামত সঠিক, কারণ আপনি কীভাবে প্রধান বিচারপতির পদে একজন মিথ্যাবাদীকে বসাবেন। রাগে, ক্ষোভে মানসূর আবূ হানীফা (র.) কে গ্রেফতার করেন এবং তাকে কারাগারে বন্দি করেন। কোনো কোনো বর্ণনামতে তাকে বিষপান করিয়ে হত্যা করা হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) কেবলমাত্র কারাগারে বসেই ১২ লক্ষ ৯০ হাজারের অধিক মাসআলা লিপিবদ্ধ করেছেন ।

সাহাবীদের সাক্ষাৎ লাভ

সর্বসম্মতিক্রমে ইমাম আবূ হানীফা (র.) একজন তাবিঈ ছিলেন। কেননা তিনি সাহাবীদের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। আল্লামা ইবন হাজার মক্কী (র.) এর মতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) তার জীবদ্দশায় হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.), আবদুল্লাহ ইবন আবী আউফা, সাহল ইবন সাআ'দ (রা.), আবূ তুফাইল (রা.), আবদুল্লাহ ইবন যুবাইদী (রা.), জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.), ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা.) প্রমুখ সাহাবীদের সাক্ষাৎ লাভ করেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর গ্রন্থাবলী

১. আল ফিকহুল আকবার। ২. আল ফিকহুল আবসাত। ৩. কিতাব আল আলিম অয়াল মুতাআল্লিম। ৪. আল ওয়াসিয়্যাহ। ৫. আর রিসালাহ। ৬. মুসনাদ আবী হানীফা। ৭. ওয়াসিয়্যা ইলা ইবনিহি হাম্মাদ। ৮. ওয়াসিয়্যা ইলা তিলমীযিহি ইউসুফ ইবন খালিদ। ৯. ওয়াসিয়্যা ইলা তিলমীযিহি আল কাযী আবী ইউসুফ। ১০. রিসালাহ ইলা উসমান আল বাত্তি। ১১. আল কাসীদা আল কাফিয়া। ১২. মুজাদালা লি আহাদিদ দাহরিন। ১৩. মারিফাতুল মাযাহিব। ১৪. আল জাওয়াবিত আস সালাসা। ১৫. রিসালা ফিল ফারাইয। ১৬. দুআউ আবী হানীফা। ১৭. মুখাতাবাতু আবী হানীফা মাআ জাফর ইবন মুহাম্মদ। ১৮. বাআয ফাতওয়া আবী হানীফা। ১৯. কিতাবুর মাকসূদ ফিস সারফ। ২০. কিতাবু মাখারিজ ফিল হিয়াল।

জীবন জিজ্ঞাসা

জবাব দিচ্ছেন-

মাওলানা আবূ নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান তাফাদার
প্রিন্সিপাল ও খতীব, আল ইসলাহ ইসলামিক সেন্টার
মিশিগান, আমেরিকা

হুসাইন আহমদ
রাখালগঞ্জ দারুল কুরআন ফাযিল মাদরাসা
দক্ষিণ সুরমা, সিলেট

প্রশ্ন: আমি আসরের নামাযের ৪ নং রাকাআতে শামিল হলাম। এখানে ইমাম সাহেবকে অনুসরণ করে আত্তাহিয়্যাতু পুরোটা পড়ব নাকি অর্ধেক পড়বো? অবশিষ্ট ৩ রাকাআত নামায আমি কীভাবে আদায় করবো?

জবাব: জামাআত নামাযে ইমামকে কোনো রাকআতে রুকুতে থাকাবস্থায় এক তাসবীহ পরিমাণ সময় পেলে উক্ত রাকআত পেয়েছেন বলে পরিগণিত হবে। সুতরাং সেভাবে ইমামকে পেয়ে থাকলে আপনার জন্য ইমামের সালাম ফেরানোর পর অবশিষ্ট ৩ রাকাআত পূর্ণ করতে হবে। আর এ অবস্থায় ইমামের শেষ বৈঠককালে তার অনুসরণে বৈঠক অতিরিক্তভাবে করতে হবে। এতে কেবল তাশাহহুদ পড়বেন। দুরূদ ও দুআয়ে মাসূরা পড়তে হবে না। ইমামের বামদিকে সালাম ফেরানোর পর দাঁড়িয়ে নিজের একাকী সম্পাদনকৃত প্রথম রাকাআতে সানা, তাআউয, তাসমিয়াহসহ সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলাবেন এবং যথানিয়মে রুকু-সিজদা শেষে প্রথম বৈঠক করবেন। এতে কেবল তাশাহহুদ পড়বেন। কেননা মোট রাকাআতের হিসাবে এটি দ্বিতীয় রাকাআত। এরপর আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে তৃতীয় রাকাআত পড়বেন। এতে তাসমিয়াহসহ সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলিয়ে যথানিয়মে রুকু-সিজদা শেষে আল্লাহু আকবার বলে চতুর্থ রাকাআতের জন্য দাঁড়াবেন। এ রাকাআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বেন। সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পড়তে হবে না। অতঃপর যথানিয়মে রুকু-সিজদা করে শেষ বৈঠক করবেন এবং তাশাহহুদ, দুরূদ ও দুআয়ে মাসূরাহ পাঠ করে সালাম ফেরানোর মাধ্যমে নামায শেষ করবেন।

আর ইমামকে চতুর্থ রাকআতে রুকুর পর পেলে ইমামের সাথে শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়বেন। এটি অতিরিক্ত বৈঠক, যা ইমামের অনুসরণে করতে হয়। ইমামের সালামের পর আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক নিয়মে চার রাকাআত নামায শেষ করবেন।

উল্লেখ্য যে, নামাযে বৈঠক কখনো দুইয়ের অধিক হয়ে থাকে। কেননা চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে যিনি তিন রাকাআত না পেয়ে মাসবূক হবেন তাকে তিনটি বৈঠক করতে হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠক ওয়াজিব হিসেবে এবং তৃতীয় বৈঠক ফরয হিসেবে করতে হবে।

আল বাহরুর রাইক গ্রন্থে আছে-

لِأَنَّ الْقَعْدَةَ فِي الصَّلَاةِ قَدْ تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ الْمَسْبُوقَ بِثَلَاثٍ فِي الرُّبَاعِيَّةِ يَقْعُدُ ثَلَاثَ قَعَدَاتٍ كُلٌّ مِنْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَاجِبٌ وَالثَّالِثَةُ هِيَ الْأَخِيرَةُ وَهِيَ فَرْضٌ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي مَسَائِلِ الْمَسْبُوقِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

(আল বাহরুর রাইক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৭-৩১৮)

[বি.দ্র. গত সংখ্যায় এ প্রশ্নের উত্তর অস্পষ্ট থাকায় এ সংখ্যায় আবার প্রদান করা হলো।]

এম. আই. রাহাত চৌধুরী
জুড়ী, মৌলভীবাজার

প্রশ্ন: টাখনুর নিচে আবা পরিধান করার শরয়ী হুকুম কী?

জবাব: আবা এমন পোশাক যা পাঞ্জাবীর ন্যায় উপরে পরিধান করা হয়ে থাকে। সুতরাং এটি পরিধানের বিধান পাঞ্জাবী পরিধানের বিধানের আওতাভুক্ত হওয়াই সমীচীন। আর টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে লুঙ্গি পরিধানের নিষেধাজ্ঞা বহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যা হযরত ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে পাঞ্জাবীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলা হয়েছে। সুতরাং টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট, পাঞ্জাবী, আবা ইত্যাদি যেকোনো পোষাক পরিধান নিষিদ্ধ তথা হারাম। কেননা হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে এবং এর কারণে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি ও জাহান্নামের শাস্তির ঘোষণা বর্ণিত হয়েছে।

সহীহ বুখারীর হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ.

-হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার কাপড় অহংকার করে (টাখনুর নিচে) ঝুলিয়ে পরিধান করবে, আল্লাহ তাআলা তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৫৭৮৩)

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾

সহীহ বুখারী, সুনান আন নাসাঈ সহ বহু হাদীস গ্রন্থে হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ.

-হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, লুঙ্গি (ইত্যাদির) যে অংশ গিরার নিচে থাকবে, তা দুযখে যাবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৫৭৮৭; সুনানে নাসাঈ, হাদীস-৫৩৩১৪)

সুনান আবূ দাউদ, মুসনাদ আহমদ, আল মু'জামুল আওসাত, আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী সহ বহু হাদীস গ্রন্থে এসেছে-

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُمَيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ

-হযরত ইয়াযীদ ইবন আবী সুমাইয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লুঙ্গির ক্ষেত্রে যা বলেছেন জামার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। (সুনান আবূ দাউদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৩; মুসনাদে আহমদ, হাদীস-৫৮৯১; আল মু'জামুল আওসাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৫; আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৬)

মুসনাদ আহমদ কিতাবে হযরত আয়িশা (রা.) থেকে অনুরূপ হাদীস এসেছে। (মুসনাদ আহমদ, হাদীস-২৬১৭৩)

আল মু'জামুল কাবীর কিতাবে হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-১২০৬)

আর টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে লুঙ্গি পরিধান করা অহংকারের কারণ হিসেবে পরিগণিত। এ সম্পর্কে সুনান আবূ দাউদ, সহীহ ইবন হিব্বান, মুসনাদ আহমদ সহ বহু হাদীস গ্রন্থে হযরত জাবির ইবন সুলাইম (রা.) থেকে

বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসে এসেছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন-

وارفَعْ إزارَكَ إلى نصفِ السَّاق، فإن أبيت فإلى الكعبينِ، وإيَّاك وإسبالَ الإزار، فإنها مِن المَخِيْلَةِ، وإن الله لا يحبُّ المَخِيْلَة،

-আর তুমি তোমার লুঙ্গি ও পাজামাকে পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত রাখবে, যদি তা সম্ভব না হয়, তবে পায়ের গিঁট পর্যন্ত রাখবে। সাবধান, তুমি লুঙ্গি বা পাজামাকে পায়ের গিঁটের নীচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরিধান করবে না। কেননা, এতে গর্ব ও অহংকার প্রকাশ পায় এবং মহান আল্লাহ গর্বকারীকে পছন্দ করেন না। (সুনান আবূ দাউদ, হাদীস-৪০৮৪ باب ما جاء في إسبال الإزار; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-৮৯৬; মুসনাদ আহমদ, হাদীস-১৬৬১৬)

সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফায়জুল বারী কিতাবে লিখেছেন-

قوله: (من جر ثوبه خيلاء) وجر الثوب ممنوع عندنا مطلقا، فهو إذن من أحكام اللباس، وقصر الشافعية النهي على قيد المخيلة، فإن كان الجر بدون التكبر، فهو جائز، وإذن لا يكون الحديث من أحكام اللباس والأقرب ما ذهب إليه الحنفية، لأن الخيلاء ممنوع في نفسه، ولا اختصاص له بالجر ...الخ

(ফয়জুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭২, كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء)

সালমান খান
নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ

প্রশ্ন: রোযা অবস্থায় যদি শরীরের কোন অঙ্গ থেকে রক্ত বের হয় কিংবা সিরিঞ্জ দিয়ে শরীর থেকে রক্ত বের করা হলে কি রোযা ভঙ্গ হবে?

জবাব: রোযা অবস্থায় শরীর থেকে রক্ত বের হলে রোযা ভঙ্গ হয় না। তদ্রুপ সিরিঞ্জ দ্বারা বের করা হলেও রোযা নষ্ট হয় না। তবে বিশেষ ওযর ছাড়া শরীর থেকে ইচ্ছাকৃত এ পরিমাণ রক্ত বের করা মাকরূহ, যার কারণে ওই দিন রোযা পূর্ণ করার শক্তি হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯৩৬, ১৯৪০; আল বাহরুর রাইক: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৩; আল হিদায়াহ: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০০; ফিকহুন নাওয়াযিল: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০০; মাজমাউল আনহুর: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬০)

রায়হান আহমদ
গোয়ালাবাজার, সিলেট

প্রশ্ন: রোযা অবস্থায় চোখে ড্রপ ব্যবহারের ফলে মুখে তিক্ততা অনুভব হলে কী রোযা ভেঙ্গে যাবে?

জবাব: না, রোযা অবস্থায় চোখে ড্রপ ব্যবহার করলে রোযা ভাঙ্গবে না। এমনকি এর তিক্ততা মুখে বা গলায় অনুভব হলেও রোযা ভাঙ্গবে না। এ মাসআলাটি সাধারণ কিয়াসের বহির্ভূত সরাসরি আছার দ্বারা প্রমাণিত। (ফাতাওয়া আলমগীরী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৩, ২০৪; আল মুগনী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৯; বাদাইয়ুছ সানায়ী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৩)

কামরুল হাসান
লালাবাজার, সিলেট

প্রশ্ন: রোযা অবস্থায় কি দাঁত ব্রাশ করা যাবে? এতে কি রোযা নষ্ট হয়ে যাবে?

জবাব: রোযা অবস্থায় টুথপেস্ট বা মাজন দিয়ে দাঁত ব্রাশ করা মাকরূহ। পেস্ট বা মাজন গলার ভেতর চলে গেলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই রোযা অবস্থায় টুথপেস্ট বা মাজন ব্যবহার করা উচিত নয়। ব্রাশ করতে হলে সাহরীর সময় শেষ হওয়ার আগেই করে নিতে হবে। (ফাতাওয়া আলমগীরী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৯; খুলাসাতুল ফাতাওয়া: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৬, ইমদাদুল ফাতাওয়া: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪১; জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৩য় খণ্ড)

রেদওয়ান আহমদ
রাজনগর, মৌলভীবাজার

প্রশ্ন: রোযা অবস্থায় যদি কেউ স্যালাইন বা ইঞ্জেকশন নেয় তাহলে কি রোযা ভেঙ্গে যাবে? অসুস্থ অবস্থায় কেউ যদি গ্লুকোজ স্যালাইন নেয় তাহলে কি তার রোযা ভঙ্গ হবে?

জবাব: স্যালাইন বা ইঞ্জেকশন নিলে রোযা ভঙ্গ হয় না। তেমনিভাবে অসুস্থতার কারণে গ্লুকোজ স্যালাইন নিলেও রোযার ক্ষতি হ বে না। তবে অসুস্থতা ছাড়া গ্লুকো জ স্যালাইন নেওয়া নাজায়িয। (আল হিদায়াহ: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০০, বাদাইয়ুছ সানায়ী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০০; আলাতে জাদিদা কে শরয়ী আহকাম: ১৫৩)

ফারুক উদ্দীন
দক্ষিণভাগ, বড়লেখা, মৌলভীবাজার

প্রশ্ন: রামাদান মাসে রোযা অবস্থায় অসুস্থতার কারণে কোনো ব্যক্তির বমি হলে রোযা ভঙ্গ হবে?

জবাব: বমি হলে রোযা ভঙ্গ হয় না। কেননা রোযা অবস্থায় অনিচ্ছাকৃত বমি হলে (যদি তা বেশিও হয়) রোযা ভাঙ্গে না। অবশ্য কেউ ইচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রোযা অবস্থায় (অনিচ্ছাকৃত) বমি হলে তা কাজা করতে হবে না। কিন্তু ইচ্ছাকৃত বমি করলে সে যেন তা কাজা করে নেয়। (তিরমিযী, হাদীস ৭২০; আল মুহিতুল বুরহানি: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৬)

মো. আবসান খান
লালাবাজার, বিশ্বনাথ, সিলেট

প্রশ্ন: রামাদান মাসে তারাবীহ নামাযের হাফিয সাহেবদের জন্য প্রদত্ত হাদিয়া থেকে ইতিকাফকারী ব্যক্তিদেরকে হাদিয়া দেওয়া জায়িয হবে কি?

জবাব: দাতাদের অনুমতিক্রমে যদি কিছু অংশ ইতিকাফকারীদের হাদিয়া দেওয়া হয় সেটা বৈধ। অন্যথায় ব্যয়ের খাত ভিন্ন হওয়ার কারণে জায়িয নয়। তবে এক্ষেত্রে প্রাপ্য হকদার হাফিয সাহেবদের অনুমতি নিলে জায়িয হবে।

কামরুল হাসান
সদর, সিলেট

প্রশ্ন: খতম তারাবীহ নামাযে অনেক জায়গায় দু'জন হাফিয ইমামের ইমামতীতে নামায আদায়ের সময় দশ রাকাআত পর ইমাম পরিবর্তন হতে দেখা যায়। শরীআতের বিধানমতো এরূপ করা কি সঠিক? জানতে চাই।

জবাব: একাধিক ইমামের ইমামতীতে তারাবীহ নামায আদায় করলে উত্তম হচ্ছে যেকোনো চার রাকাআতের পর ইমাম পরিবর্তন করা। কেননা প্রতি চার রাকাআত মিলে একটি তারাবীহ (বিরতি) হওয়ার কারণে এ নামাযকে তারাবীহ নামায বলা হয়। তাই কোনো একটি তারাবীহ পূর্ণ না করে এর মধ্যবর্তী কোনো সালামের পর ইমাম পরিবর্তন করা ফুকাহায়ে কিরামের নির্ভরযোগ্য অভিমত অনুযায়ী

মুস্তাহাব পরিপন্থি তথা মাকরূহ।

এ সম্পর্কে 'আল ফাতাওয়া আল হিন্দীয়্যাহ'তে আছে-

والأفضل أن يصلي التراويح بإمام واحد فإن صلوها بإمامين فالمستحب أن يكون انصراف كل واحد على كمال الترويحة فإن انصرف على تسليمة لا يستحب ذلك في الصحيح

(আল ফাতাওয়া আল হিন্দীয়্যাহ: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৬; আল জাওহারাতুন নায়্যিরাহ: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৮)

তাই দশ রাকাআতের পর ইমাম পরিবর্তন না করে, আট রাকাআত কিংবা বারো রাকাআতের পর ইমাম পরিবর্তন করা উচিত।

ফারুক উদ্দীন
ফুলবাড়ী, গোলাপগঞ্জ, সিলেট

প্রশ্ন: তাহাজ্জুদের নামায জামাআতে পড়া কি জায়িয? দলীলসহ জানতে চাই।

জবাব: হানাফী মাযহাব মতে, তাহাজ্জুদের নামায আয়োজনপূর্বক জামাআতে আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ফরয পাঁচ ওয়াক্তের নামায জামাআতে আদায় করা এবং এর জন্য আযান-ইকামতের ব্যবস্থা করা জরুরি। অনুরূপভাবে দুই ঈদের নামায এবং রামাদান মাসে তারাবীহ ও বিতর নামায জামাআতের সাথে আদায় করা সাব্যস্ত রয়েছে। জানাযার নামায, বৃষ্টি প্রার্থনার নামায, সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণের নামাযও জামাআতের সাথে পড়ার বিষয়ে শরীআতের দলীল দ্বারা সাব্যস্ত। এছাড়া বাকি অন্য কোনো ধরনের নামায যেমন- তাহাজ্জুদ, চাশত, আওয়াবীন, ইশরাক ইত্যাদি জামাআতের সাথে আদায় করার নিয়ম নেই। এ সম্পর্কে যে বিষয়টি ফুকাহায়ে কিরাম কারণ হিসেবে বিবেচনায় নিয়েছেন, তা হচ্ছে-

১. তাহাজ্জুদের নামায নফল নামাযের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ প্রকারের নামায বিনা জামাআতে একাকী ঘরে পড়াকে পছন্দ করেছেন ও উত্তম বলেছেন। যেমন, হাদীস শরীফে এসেছে-

صلاة المرء في منزله أفضل من صلاته في مسجده إلا المكتوبة

-ফরয নামায ব্যতীত অন্যান্য নামায মসজিদে (জামাআতে) আদায়ের চেয়ে ঘরে (একাকী) পড়াই উত্তম। (শরহু মাআনিল আসার)

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন ও তাবে তাবিঈন থেকে তাহাজ্জুদের নামায বড় জামাআতে আদায়ের কোনো নিয়ম প্রমাণিত নেই। আর হাদীসে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে 'কিয়ামুল লাইল' তথা তাহাজ্জুদ নামাযে ইকতিদা করার এবং হযরত আবুদ্দারদা (রা.) হযরত সালমান (রা.) এর সাথে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার যে বর্ণনা পাওয়া যায় এর ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কিরামের কেউ কেউ ইমাম ব্যতীত মুকতাদী মাত্র তিন জন পর্যন্ত সীমিত হলে মাকরূহ ব্যতীত জায়িয বলেছেন। এর চেয়ে অধিক মুকতাদী তথা চারজন কিংবা ততোধিক হলে মাকরূহ। এ সম্পর্কে 'ফাতাওয়া আলমগীরী' কিতাবে লিখেছেন-

التطوع بالجماعة إذا كان على سبيل التداعي يكره وفي الأصل للصدر الشهيد أما إذا صلوا بجماعة بغير أذان وإقامة في ناحية المسجد لا يكره، وقال شمس الأئمة الحلواني: إن كان سوى الإمام ثلاثة لا يكره بالاتفاق وفي الأربع اختلف المشايخ والأصح أنه يكره. هكذا في الخلاصة.

(আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৩)

মারুফ আহমদ
নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ

প্রশ্ন: ইতিকাফে থাকাবস্থায় কোনো ধর্মীয় আলোচনায় ভিডিও কল বা জুম ইত্যাদি মারফতে অংশগ্রহণ করা যাবে কি?

জবাব: ইতিকাফকালীন সময়ে মসজিদে অবস্থান করে নেকীর যেকোনো কাজ করার মধ্যে শরীআতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। সুতরাং বর্ণিত ভিডিও কলে কিংবা জুমে অংশগ্রহণপূর্বক দ্বীনী আলোচনা বৈধ। এতে ইতিকাফের কোনো অসুবিধা হবে না। তবে অডিওকল/ভিডিও কল যাই হোক, এসবের জন্য মসজিদে অবস্থানরত অন্যদের যেন একান্ত ইবাদতে কোন ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি না হয়, অন্যদের বিরক্তির কারণ না হয়, এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ রাসূল (সা.) একবার ই'তিকাফ করছিলেন, রাতে অন্য সাহাবীগণ নিজেরা উচুস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন, তখন রাসূল (সা.) তাদেরকে এভাবে তিলাওয়াত করতে নিষেধ করে বলেন, তোমরা একে অপরকে কষ্ট দিও না, কেননা তোমরা সকলেই তোমাদের রবের নিকট একান্তে মুনাজাত করছো। (মুসনাদ আহমদ, ১১৯১৫)

তাই অপর ইতিকাফকারীদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে ভিডিও কল বা জুম ইত্যাদি মারফত ধর্মীয় আলোচনায় অংশগ্রহণে কোন বাধা নেই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন: কোনো মহিলার গর্ভস্থ সন্তান ৩ মাসের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তার ভ্রূণ বের হওয়ার পর রক্তস্রাব হয়েছে, এতে তার নামায ও রোযার বিধান কি?

জবাব: গর্ভস্থ সন্তানের দেহের অর্ধেকের বেশি অংশ বের হলে উক্ত সন্তান নষ্ট হওয়ার পর যে রক্তস্রাব হবে তা নিফাস হিসেবে পরিগণিত হবে। তদ্রূপ ভ্রূণের মধ্যে আঙ্গুল, নখ, চুল কিংবা মানবাকৃতির যেকোনো নমুনা প্রকাশ পেলে উক্ত রক্তস্রাব নিফাস হিসেবে পরিগণিত হবে। এ অবস্হায় ছুটে যাওয়া নামায পড়তে হবে না। অবশ্য ছুটে যাওয়া ফরয রোযার পরে কাযা করতে হবে। আর দেহের অর্ধেকের চেয়ে কম বের হলে কিংবা মানবাকৃতির কোন নমুনা প্রকাশ না পেলে তা নিফাস হিসেবে গণ্য হবে না। তাই এ অবস্হায় তার নিয়মতান্ত্রিক নামায, রোযা আদায় করা আবশ্যক।

আল বাহরুর রাইক কিতাবে লিখেছেন,

الدم الخارج عقب خروج أكثر الولد كالخارج عقب كله فيكون نفاسا، وإن خرج الأقل لا يكون حكمها حكم النفساء ولا تسقط عنها الصلاة ولو لم تصل تكون عاصية لربها،

(আল বাহরুর রাইক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৯)

উক্ত কিতাবে আরো লিখেছেন,

(قوله: والسقط إن ظهر بعض خلقه ولدا) وهو بالكسر والتثليث لغة، كذا في المصباح وهو الولد الساقط قبل تمامه وهو كالساقط بعد تمامه في الأحكام فتصير المرأة به نفساء

(আল বাহরুর রাইক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৯)

এ সম্পর্কে আল ফাতাওয়াল হিন্দীয়্যাহ কিতাবে লিখেছেন,

لو خرج أكثر الولد تكون نفساء وإلا فلا وكذا لو انقطع فيها وخرج أكثره والسقط إن ظهر بعض خلقه من أصبع أو ظفر أو شعر ولد فتصير به نفساء. هكذا في التبيين وإن لم يظهر شيء من خلقه فلا نفاس لها فإن أمكن جعل المرئي حيضا يجعل حيضا وإلا فهو استحاضة

(আল ফাতাওয়াল হিন্দীয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭)

ঘরোয়া

ফৌজিয়া সুলতানা জুঁই

সাধারণ সর্দি-জ্বরে বেহাল অবস্থা? অস্বস্তিতে ভুগছেন? কোনোভাবেই শান্তি পাচ্ছেন না? তাহলে জেনে রাখতে পারেন কিছু কার্যকরী ঘরোয়া টিপস। যা আপনাকে অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে প্রাথমিকভাবে মুক্তি দিতে পারে। সাধারণ সর্দি-জ্বর বা ঠান্ডা লেগে জ্বর, এটি কী এবং কেন হয়। আজ আমরা সে বিষয়ে জানবো এবং এর থেকে প্রতিকার পাওয়ার ঘরোয়া উপায় সম্পর্কেও জানবো।

ঠান্ডা লেগে জ্বর বলতে সাধারণত মৃদু থেকে মাঝারি মাত্রার জ্বর-কে বোঝানো হয়, যা সাধারণত সর্দির সঙ্গে থাকে। এটি 'ফ্লু' এর মতো উচ্চমাত্রার জ্বর নয় বরং হালকা জ্বর যা কয়েকদিন ধরে থাকে। এই জ্বরের সাধারণ লক্ষণগুলো হলো-

➢ সাধারণত ৯৯ থেকে ১০১°F মৃদু জ্বর।

➢ নাক দিয়ে পানি পড়া বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া।

➢ বারবার হাঁচি আসা।

➢ স্থায়ী কাশি।

➢ গলাব্যথা বা গলায় খুসখুসে অনুভূতি।

➢ শরীরব্যথা, ক্লান্তি ও হালকা মাথাব্যথা।

কেন হয়?

সাধারণ ভাইরাসজনিত সংক্রমণের কারণে ঠান্ডা লেগে-জ্বর ওঠে। বিশেষ করে শীতকালে এটি বেশি হয়। এই জ্বরের কিছু প্রধান কারণ হলো-

➢ **আবহাওয়ার পরিবর্তন:** শীতকালে ইমিউনিটি কিছুটা দূর্বল হয়ে পড়ে, যা শরীরে ভাইরাস প্রবেশ করতে সাহায্য করে।

➢ **ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ:** জনবহুল স্থান থেকে এই ভাইরাস দ্রুত ছড়ায়।

➢ **দুর্বল ইমিউনিটি চাপ:** পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব অথবা অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ইমিউনিটি দূর্বল করে দেয়, যা সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ায়।

ঠান্ডা-জ্বর প্রতিরোধের উপায়:

➢ সাবান ও পানি দিয়ে নিয়মিত হাত ধোয়া। এতে জীবাণু ধ্বংস হয়।

➢ মুখে হাত না দেওয়া। ভাইরাস নাক,চোখ বা মুখ দিয়ে প্রবেশ করতে পারে।

➢ মাস্ক পরা। বিশেষ করে জনবহুল স্থানে মাস্ক আপনাকে সুরক্ষিত রাখতে পারে।

➢ ইমিউনিটি বাড়ান। সুষম খাবার খান, পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমান এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করুন। সুস্থ্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা সবসময়ই কার্যকর।

ঠান্ডাজনিত সর্দি-জ্বরের ঘরোয়া প্রতিকার:

➢ **আদা-চা:** আদার মধ্যে ২ গুন প্রদাহনাশক থাকে এবং এটি গলাব্যথা কমাতে সাহায্য করে। সাথে মধু মেশালে আরও উপকার পাবেন।

➢ **গরম-পানির ভাপ:** ফুটন্ত গরম পানিতে ইউক্যালিপটাস তেল বা পুদিনা পাতা দিয়ে পানির সামনে তোয়ালে দিয়ে মাথা ঢেকে ৫-১০ মিনিট ভাপ নিন।

➢ **মধু-লেবু পানি:** এক চামচ মধু এবং লেবুর রস গরম পানিতে মিশিয়ে পান করুন। মধু কাশির প্রশমনে সহায়ক এবং লেবু ভিটামিন সি সরবরাহ করে।

➢ **লবন পানির গার্গল:** গলাব্যথা কমাতে কুসুম গরম পানিতে লবণ দিয়ে গার্গল করুন।

➢ **গরম স্যুপ:** স্যুপ শুধু হাইড্রেটই করে না, বরং প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও জোগায়।

➢ **রসুন ও কালোজিরা:** রসুনে অ্যান্টিভাইরাল উপাদান থাকে, যা সংক্রমণ কমাতে সাহায্য করে। কালোজিরা রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

➢ **প্রচুর পরিমাণ পানি পান করুন:** শরীরে পানির ঘাটতি পূরণ হলে ভাইরাস দ্রুত বের হয়ে যায়।

➢ **ভিটামিন-সি:** ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ খাবার খান। যেমন-কমলা, লেবু, আমলকি, পেয়ারা,টমেটো ইত্যাদি।

➢ **বিশ্রাম:** পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশ্রাম নিন। ঘুম ও বিশ্রাম শরীরকে দ্রুত সেরে তুলতে সহায়তা করে।

কখন ডাক্তার দেখানো উচিত

যদি আপনার জ্বর ১০১°F এর উপরে চলে যায় এবং অনুভব করেন যে জ্বর কমছেই না অথবা যদি শ্বাসকষ্ট বা বুকের ব্যথা অনুভব করেন এবং এই লক্ষণগুলো যদি ১০ দিনের বেশি সময় ধরে স্থায়ী হয়,খুব বেশি দূর্বল বা ডিহাইড্রেটেন্ড অনুভব করেন তখন তাড়াতাড়ি ডাক্তারের শরণাপন্ন হোন। ঠান্ডা লেগে সর্দি-জ্বর অস্বস্তিকর হলেও সঠিক যত্নের মাধ্যমে এটি থেকে দ্রুত আরোগ্য লাভ করা সম্ভব। ◘

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
"ঈমান, আমাল ও আকীদা বিষয়ক আপনার যেকোনো প্রশ্ন আজই পরওয়ানার অনুকূলে পাঠিয়ে দিন।???
জীবন জিজ্ঞাসা বিভাগে
প্রশ্ন করার নিয়ম
শুধুমাত্র প্রশ্নের মূল কথাগুলো লিখে পাঠাতে হবে
ই-মেইল অথবা ডাকযোগে প্রশ্ন পাঠাতে পারবেন
প্রশ্ন করুন
প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা
অফিস: ফুলতলী কমপ্লেক্স ঢাকা, ৩৩৪/৪এ, দক্ষিণ গোড়ান, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
সিলেট বিভাগীয় অফিস: পরওয়ানা ভবন-৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সিলেট
E-mail: parwanabd@gmail.com

বিজ্ঞান

পরওয়ানা ডেস্ক

দাবানল (Wildfire) কী, কেন হয়

যখন বন্য পরিবেশে গাছপালা এবং উদ্ভিদে প্রচণ্ড আগুন ধরে যায় এবং সে আগুন অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে, তখন তাকে (Wildfire) দাবানল বলে। বনাঞ্চল, তৃণভূমি এবং অন্যান্য বাস্তুতন্ত্রেও (Ecosystem) দাবানল দেখা যায়। লাখ লাখ বছর ধরে এমনই হয়ে আসছে। নির্দিষ্ট কোনো মহাদেশ বা পরিবেশের মধ্যে এ দাবানল সীমাবদ্ধ নয়। জানুয়ারির শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের উত্তর-পশ্চিমের বিভিন্ন এলাকায় ভয়াবহ আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী শহর সান্তা মনিকা ও মালিবুর মতো সমুদ্রতীরবর্তী এলাকা জলেছে। এছাড়াও প্যাসাডেনার আশপাশের উপশহর এবং সান ফার্নান্দো উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চলে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। এতে ২১ হাজার একরের বেশি এলাকা পুড়ে গেছে । লস অ্যাঞ্জেলেসের ইতিহাসে এত ধ্বংসাত্মক দাবানল এর আগে দেখা যায়নি। বলা হচ্ছে, কোনো অগ্নিনির্বাপন (Fire-extinguishing) কার্যক্রম দিয়ে এই দাবানল ঠেকানো সম্ভব নয়। অগ্নিনির্বাপকের গাড়িগুলোর পানি একের পর এক ফুরিয়ে যাচ্ছে। এই দাবানলে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ে সংলগ্ন প্যালিসেডস ফায়ার দাবানলটি আকারে সবচেয়ে বড়। উল্লেখ্য যে,দাবানলগুলোকে স্থানগুলোর নামানুসারেই চিহ্নিত করা হচ্ছে ।

ক্যালিফোর্নিয়ায় বছরের শুরুর সময়ে কিছু দাবানল দেখা যায়। যখন পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টি হয় না তখন গাছপালা শুষ্ক হয়ে যায়। শীতকালে ঠান্ডা আবহাওয়ার সঙ্গে বাতাসের প্রবাহ বেড়ে যাওয়ার ফলে এসব অঞ্চলে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক দাবানল দেখা যায়। সাধারণত যেখানে প্রচুর গাছপালা থাকে এবং আবহাওয়া শুষ্ক হয় সেসব এলাকাগুলোতে বেশি দেখা দাবানলের ঘটনা ঘটে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া, ওরিগন, ওয়াশিংটন এবং নেভাদা ও অ্যারিজোনার কিছু অংশ দাবানলের জন্য পরিচিত। সেখানে শুষ্ক গ্রীষ্ম, তীব্র বাতাস এবং বিস্তৃত বনাঞ্চল থাকায় দাবানলের ঝুঁকি অনেক বেশি। অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে গ্রীষ্মকালে মারাত্মক দাবানল দেখা যায়। এছাড়াও স্পেন, পর্তুগাল, ইতালি এবং গ্রিসসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলোতে গরম ও শুষ্ক গ্রীষ্মকাল হওয়ায় প্রায়ই দাবানলের ঘটনা ঘটে। বন নিধন, জমি পরিষ্কার ও মানুষের নানা কার্যকলাপের কারণে ব্রাজিলের আমাজন অঞ্চলেও দাবানল ঘটে। পূর্বে দাবানলের ঘটনা ঘটেছে, এমন এলাকায় দাবানল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

দাবানল কেন হয়?

প্রধানত স্থানীয় পরিস্থিতি দাবানলের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখে। এটি খরা,উচ্চ তাপমাত্রা এবং দাহ্য উদ্ভিদের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দাবানলের প্রকৃতিও বদলে যাচ্ছে। বাড়ছে আগুন লাগার সংখ্যা। মানুষের অসতর্কতামূলক কার্যকলাপের করেণে বেশির ভাগ দাবানল হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের ৮৪ শতাংশ দাবানলের কারণ হলো, মানুষ ও মানুষের কার্যকলাপ। সেখানে মানবসৃষ্ট আগুন থেকে ঘরবাড়ির জন্য হুমকিস্বরূপ ৯৭ শতাংশ দাবানল শুরু হয়। মানুষের অসতর্কতা,ভুলভাবে ফেলা সিগারেটের টুকরো,আতশবাজি, সঠিক নিয়ম না মেনে জ্বালানো ক্যাম্পফায়ার থেকে দাবানল শুরু হয়। ২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ফেলে দেওয়া সিগারেটের কারণে সৃষ্ট দাবানলে ৬ বিলিয়ন বা ৬০০ কোটি ডলারের সয়-সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মানবসৃষ্ট এসকল কারণে অনেক নতুন অঞ্চলে দাবানলের ঝুঁকি বাড়ছে। মজার বিষয় হচ্ছে, দাবানল শুধু ক্ষতি করে না এর কিছু উপকারও আছে। তা হলো-মাঝে মাঝে আগুন না লাগলে বনাঞ্চলের ন্যাচারাল ইকোসিস্টেম নষ্ট হয়ে যায় । দাবানলে মৃত ও পচনশীল দ্রব্যাদি পুড়ে গিয়ে পরিবেশ শুদ্ধ হয়। অগ্নিকাণ্ডের পরে গাছের কাণ্ডে জমে থাকা পুষ্টি আবার জমিতে ফেরত আসে । যাবতীয় ক্ষতিকারক পোকামাকড় ধ্বংস হয়, রোগ জীবাণু নষ্ট হয় । উঁচু গাছের ডাল-পাতা পুড়ে গিয়ে অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে বনে সূর্যের আলো ঢুকে। মাটিতে নতুন পুষ্টি যোগায়। ঝোপঝাড় ও আগাছা পরিষ্কার করার মাধ্যমে নতুন ঘাস, ভেষজ উদ্ভিদ এবং ঝোপ জন্মানোর সুযোগ পায়। ফলে, নতুন করে প্রাণী ও পাখিদের খাদ্য ও বাসস্থান তৈরি হয়। দাবানল শুধু মাটির উপরের গাছপালা জ্বালায় না বরং মাটির নিচের গাছপালার শেকড়েও আগুন জ্বালাতে পারে। যখন মাটিতে প্রচুর জৈব পদার্থ জমা থাকে তখন দীর্ঘ সময় ধরে, কখনো কখনো পুরো মৌসুমজুড়ে মাটির নিচে আগুন জ্বলতে থাকে। কিছু কিছু গাছের প্রজাতির টিকে থাকার জন্য দাবানল অপরিহার্য। এর মধ্যে রয়েছে ম্যানজানিটা, চামিস এবং স্ক্রাব ওক। এগুলো আগুনের তাপেই বীজ অঙ্কুরিত করতে পারে। এসব উদ্ভিদের পাতায় দাহ্য পদার্থ বেশি থাকে। কিছু উদ্ভিদের জন্য কয়েক বছর পরপর আগুনের প্রয়োজন হয়। আবার কিছু প্রজাতির উদ্ভিদের জন্য দাবানল প্রয়োজন হয় কয়েক দশক পরপর।

দাবানল প্রাকৃতিকভাবেও ঘটে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু, উদ্ভিদ ও ভূপ্রকৃতির উপর নির্ভর করে দাবানল সৃষ্টির প্রাকৃতিক কারণগুলো ভিন্ন হতে পারে। প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে আছে বজ্রপাত, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং সূর্যের তাপ ইত্যাদি। এর মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে দাবানল সৃষ্টির সবচেয়ে সাধারণ কারণ বজ্রপাত। বজ্রপাতে বিদ্যুতের লাইন, গাছ, ঝোপঝাড় বা শুকনো ঘাসে আগুন লাগে। বিবিসির তথ্যানুযায়ী, ২০২০ সালের আগস্ট মাসে ক্যালিফোর্নিয়ায় ১২ হাজারের বেশি বজ্রপাতের কারণে ৬৫০টিরও বেশি দাবানল হয়েছিল, যা ১৫ লাখ একরের বেশি জমি পুড়িয়ে দিয়েছিল। এর ফলে লাখ লাখ মানুষকে সরিয়ে নিতে হয়েছিল। এর খরচও কম নয়। প্রতিবছর দাবানলের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ হয় প্রায় ৮৯৩ বিলিয়ন ডলার! ২০১৪ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ৫২ হাজার ২৬০টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে প্রতি বছর আনুমানিক ৪০০ মানুষ নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৯৫০ জন। ধ্বংস হয়েছে ৮১৫ মিলিয়ন ডলারের সম্পত্তি। ২০০৭ সালে অসাবধানতাবশত ক্যাম্পফায়ারের কারণে ঘটা ভয়াবহ দাবানলের একটি উদাহরণ হলো হ্যাম লেক দাবানল। এই দাবানলে মিনেসোটার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় ৭৫ হাজার একর বন পুড়ে গিয়েছিল।

এছাড়া শুকনো পাতায় আগুন লেগেও দাবানলের ঘটনা ঘটতে দেখা যায় । জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘন ঘন চরম আবহাওয়ার কবলে পড়ে দাবানলের ঝুঁকি বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, সামনে আরও বেশি এ ধরনের ঘটনা দেখা যাবে। দাবানলে লাখো প্রাণী মারা যায় ঠিকই, তবে বাস্তুতন্ত্রকে স্বাস্থ্যকর রাখতেও দাবানল সহায়তা করে। তাই বলে মানবসৃষ্ট বা যে দাবানলের জন্য মানুষের কার্যকলাপ দায়ী, তা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

অভ্যন্তরীণ

ফুলতলীতে ঈসালে সাওয়াব মাহফিলে লাখো মানুষের ঢল

ন্যায়ের উপর অবিচল থেকে শ্যামল-সুন্দর জন্মভূমির মানুষকে ভালোবাসি

-আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

১৫ জানুয়ারি (বুধবার) লাখো মানুষের উপস্থিতিতে ফুলতলী ছাহেব বাড়ি সংলগ্ন বালাই হাওরে অনুষ্ঠিত হয়েছে আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর ১৭তম ইন্তেকাল বার্ষিকী উপলক্ষে বিশাল ঈসালে সাওয়াব মাহফিল। ধর্মীয় আবেগঘন পরিবেশ ও সুশৃঙ্খল এ মাহফিলে মুরিদীন-মুহিব্বীনের উদ্দেশ্যে তা'লীম-তরবিয়ত পেশ করেন আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর সুযোগ্য উত্তরসূরী উস্তাযুল উলামা ওয়াল মুহাদ্দিসীন, মুরশিদে বরহক হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী বড় ছাহেব ফুলতলী। তিনি বলেন, যুগে যুগে অনেক যালিমের আবির্ভাব হয়েছে। যালিম শাসকের উদাহরণ হিসাবে আমরা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নাম উল্লেখ করি । সে হুকুমত প্রতিষ্ঠা ও কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য হাজার হাজার আলিম-উলামাকে হত্যা করে। এমন শাসক বাহাদুরী দেখানোর জন্য নানা প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করে থাকে। হাজ্জাজ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। তা দেখে হাসান বসরী (র.) বলেছিলেন, নমরূদ প্রাসাদ এর চেয়ে আরো উন্নত ছিল। সে প্রদর্শনীর জন্য চারশত ঘোড়া রেখেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে বেয়াদবীমূলকভাবে সে হযরত আনাস রা. কে বলেছিল, তোমার সাথি তথা রাসূল (সা.) এর এমন কোনো ঘোড়া কি ছিল? হযরত আনাস (রা.) প্রিয়নবী (সা.) এর বাণী উল্লেখ করে বলেছিলেন, ঘোড়া তিন শ্রেণির। বাহাদুরী প্রদর্শনের ঘোড়াকে তিনি দোযখের ঘোড়া বলেছিলেন, অর্থাৎ এটি দোযখে নিয়ে যাবে। একথা শুনে হাজ্জাজ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়। কিন্তু হযরত আনাস (রা.) রাসূল (সা.) এর শেখানো দুআ পাঠ করায় সে তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। আমাদের দেশের এক নাস্তিকও উম্মুল মুমিনীনদের শানে বেয়াদবীমূলক উক্তি করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও উম্মুল মুমিনীনদের সাথে বেয়াদবী থেকে বেঁচে থাকবেন। যারা তাদের সম্পর্ক খারাপ মন্তব্য করে তাদের সম্পর্ক মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবন উবাই'র সাথে হবে। কুরআন কারীমের প্রতি আদব প্রদর্শনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, শাআইরুল্লাহ তথা আল্লাহর নিদর্শনাবলির সম্মান না করলে তাকওয়া বিনষ্ট হয়। খারিজীদের ইমাম আবু তাহের কারামিতী হাজরে আসওয়াদ খুলে নিয়ে গিয়েছিল। হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া তার মতে ছিল শিরক। সেই কারামিতীর অনুসারীরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহে শিরক দেখে।

তিনি বলেন, মনের আবেগে দীন-দুঃখী মানুষের পাশে যাই। এতীম অনাথের সাথে মাটির আসনে বসি। এতে যে প্রশান্তি পাওয়া যায় অন্য কোথাও এমন পাওয়া যায় না। আল্লাহর ওয়াস্তে দীন-দুঃখী মানুষের খেদমত করবেন। আমরা কয়েক হাজার মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছি। বন্যা কবলিত কুমিল্লা, নোয়াখালীতে আমাদের উদ্যোগে গৃহনির্মাণ হয়েছে। কোথাও কারো ঘর আগুনে পুড়ে গেলে আমরা পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করি। বৃক্ষরোপণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, যদি কোনো মুমিন চারা লাগায়, ফসল ফলায় এবং তা থেকে কোনো মানুষ কিংবা পশু-পাখি খায় তাও সদকাহ হিসাবে গণ্য হবে।

তিনি আরো বলেন, দেশের অবস্থা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আকার ধারণ করে । আমরা দুআ করি যুলমকারী কেউ যেন আমাদের মাথার উপর না বসে। শয়তানী চরিত্রের কেউ যেন আমাদের কর্তৃত্বে না আসে। হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এমন কেউ যেন না আসে। কখনো কোনো পরিস্থিতির শিকার হলে আমরা যেন অবিচার না করি। আমরা যেন যালিম না হই, মজলুম না হই। আমরা যেন সর্বাবস্থায় ন্যায়ের উপর অবিচল থেকে শ্যামল-সুন্দর জন্মভূমির মানুষকে ভালোবাসি, হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকি।

সকাল সাড়ে ১০টায় হাজারো এতীমসহ উপস্থিত মুরীদীন-মুহ্বিনদের নিয়ে আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর মাজার যিয়ারতের মধ্য দিয়ে মাহফিলের কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর খতমে কুরআন, খতমে বুখারী, খতমে খাজেগান, খতমে দালাইলুল খাইরাতের পাশাপাশি স্মৃতিচারণমূলক ও জীবনঘনিষ্ট আলোচনায় অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে অতিবাহিত হয় পুরো দিন। ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী, ফুলতলী কামিল মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা নজমুল হুদা খান, মাসিক পরওয়ানার সম্পাদক মাওলানা রেদওয়ান আহমদ চৌধুরী ও জার্মানির এরফোর্ট বিশ^বিদ্যালয়ের গবেষক মাওলানা মারজান আহমদ চৌধুরীর যৌথ পরিচালনায় মাহফিলে দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা ইসলামী স্কলারগণ বক্তব্য রাখেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বাংলাদেশের পুলিশ, র‌্যাব ও আনসার বাহিনীর পোশাক পরিবর্তন করে নতুন রংয়ের পোশাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন পোশাকের ছবি দেখার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তা নিয়ে হাস্যরস ও মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। একজন ফেসবুক পোস্ট লিখেছেন,হলুদ হিমু,পেস্ট কালারের র‌্যাব। অনেকে লিখেছেন- র‌্যাব,পুলিশের চাইতেও আনসারকে অনেক স্মার্ট দেখাচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুলিশের পোশাকের রং হচ্ছে আয়রন, র‌্যাবের পোশাক অলিভ বা জলপাই রংয়ের এবং আনসারের পোশাকের রং গোল্ডেন হুইট। এই তিনটির মধ্যে র‌্যাবের পোশাক নিয়ে সবচেয়ে বেশি হাস্যরস তৈরি হয়েছে । আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পোশাক পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে পুলিশ, র‌্যাব ও আনসার কর্মকর্তাদের সদস্যদের অনেককেই অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা গেছে। তবে তারা কেউই নিজেদের নাম প্রকাশ করতে চাননি। পোশাক পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, মানসিকতায় পরিবর্তন আনতেই পোশাকের পরিবর্তন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক আইজি নুরুল হুদার কাছে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,পোশাক পরিবর্তন করে আচরণগত কোন পরিবর্তন না আসার সম্ভাবনাই বেশি। আচরণগত পরিবর্তন করতে হলে নীতি ও কৌশল দরকার।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের গঠিত এগারটি কমিশনের মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন,নির্বাচন কমিশন সংস্কার,দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন,পুলিশ সংস্কার কমিশন সুপারিশসহ তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন,জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন আগামী ৩১শে জানুয়ারি রিপোর্ট জমা দেয়ার কথা। এছাড়াও, স্বাস্থ্য, শ্রম, গণমাধ্যম, নারী বিষয়ক ও স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাদের রিপোর্ট জমা দেয়ার জন্য সময় পেয়েছে। এসব সুপারিশ কতটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে, আদৌ হবে কি না অথবা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলো চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়াতে পারে এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে নানা ধরনের আলোচনা শুরু হয়েছে। জানা গেছে কিছু কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হলে প্রথমে সংবিধান সংশোধন করতে হবে আর কিছু সুপারিশ বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নির্বাহী আদেশে বাস্তবায়ন করতে পারলেও গত পাঁচ অগাস্টের পর থেকে বাংলাদেশে যা কিছুই হচ্ছে সবই আগামী সংসদে অনুমোদন করাতে হবে। তাই এই সংশয়ও আছে যে, সংস্কার বিষয়ক সব সুপারিশ পরবর্তী সংসদ না-ও গ্রহণ করতে পারে। কেননা সুপারিশগুলো সব দলের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলে কিংবা তাদের মধ্যে যদি ন্যূনতম ঐকমত্য না হলে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সুপারিশ শেষ পর্যন্ত কাগজেই থেকে যেতে পারে। দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিটির প্রধান ডঃ ইফতেখারুজ্জামান বলছেন,“এগুলোর কিছু বাস্তবায়ন হবে কি না, তা শেষ পর্যন্ত নির্ভর করবে সামরিক বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক দলের ওপর।” প্রসঙ্গত, ২০০৭ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের ক্ষমতায় আসার পর সংস্কার ইস্যুটি ব্যাপকভাবে আলোচনায় আসলেও শেষ পর্যন্ত

দলগুলোর মধ্যকার গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে তা খুব একটা বাস্তবায়ন হয়নি। এরই মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্টটি ব্যাপকভাবে আলোচনায় এসেছে । বিশেষ করে সংবিধান সংস্কারে গঠিত কমিশনের সুপারিশগুলোর মধ্যে বাহাত্তরের সংবিধানের মূলনীতি পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে বহুল আলোচিত। সম্প্রতি এই কমিশনের প্রধান আলী রিয়াজ অবশ্য বলছেন, সুপারিশগুলোর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে একনায়কতন্ত্রের পথ বন্ধ করার প্রয়াস নিয়েছেন তারা। এই কমিশন সংবিধানে পরিবর্তন এনে বর্তমান সরকার ও জাতীয় সংসদের মেয়াদ চার বছর করা, এক কক্ষ বিশিষ্ট সংসদকে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট করা, প্রধানমন্ত্রী পদে দুই বারের বেশি না থাকা, সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ন্যূনতম বয়স ২১ বছর করা এবং সংসদের বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার বানানোর প্রস্তাব রয়েছে। এছাড়াও, একজন সংসদ সদস্য প্রধানমন্ত্রী পদে থাকলে দলীয় প্রধান ও সংসদ নেতা হিসেবে থাকতে পারবেন না।

আন্তর্জাতিক

২০২৫ সালের জানুয়ারি মাস পুরোটাই যেন ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। গত নভেম্বরে নির্বাচিত এই স্বৈরমনোভাবাপন্ন প্রেসিডেন্ট প্রথা অনুযায়ী ২০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে দায়িত্ব গ্রহণের কথা থাকলেও সারা দুনিয়ার খবর তাকে ঘিরে আবর্তিত হতে শুরু করে বছরের শুরু থেকেই। কানাডাকে নিজেদের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করার ঘোষণা, গ্রিনল্যান্ড কিনে ফেলার কিংবা দখল করার আগ্রহ প্রকাশ থেকে শুরু করে গাযা-ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি চুক্তি, সর্বত্র তার উপস্থিতিই সকলের নযর কাড়তে বাধ্য হয়।

গাযায় যুদ্ধবিরতি ও বন্দিবিনিময় চুক্তিটি বাইডেনের আমলে প্রস্তাবিত হলেও ট্রাম্প দায়িত্বগ্রহণের প্রাক্কালে ইসরায়েলের উপর চাপ প্রয়োগ করে সেটি বাস্তবায়ন করেন। পুরো জানুয়ারি মাস জুড়ে কাতারের রাজধানী দোহায় কাতার, মিসর ও যুক্তরাজ্যের মধ্যস্থতায় হামাস এবং ইসরায়েলের মধ্যকার আলোচনা শেষে ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ অবশেষে উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতি শুরু হয়। যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত অবধি ইসরায়েল তাদের নৃশংসতা অব্যাহত রাখে। এ দিকে এই চুক্তিকে কেন্দ্র করে কট্টর ডানপন্থী জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতমার বেনগাভির নেতানিয়াহুর মন্ত্রীসভা থেকে সদলবলে পদত্যাগ করেন। জাতিসংঘের দেওয়া তথ্য মতে গাযার ৯২ শতাংশ ঘরবাড়ি ১৫ মাসের যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গেলেও ইসরায়েলের পক্ষে এ যুদ্ধবিরতিকে তাদের বিজয় হিসেবে দেখা সম্ভব হচ্ছে না বহু কারণে, মূলত সে জন্যই কট্টরপন্থী বেনগাভির ও তার দলের অন্য মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেছেন। যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়নের পরপর গত ২১ জানুয়ারি তারিখে ৭ অক্টোবরের তুফান প্রতিহত করার ব্যর্থতার দায় নিয়ে পদত্যাগ করেছেন ইসরায়েলের সেনা প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হেরজি হালেভি।

গাযায় যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়ন হলেও এর কোন প্রভাব পড়েনি পশ্চিম তীরে। চুক্তির অংশ হিসেবে পশ্চিম তীরের অনেক অধিবাসী ইসরায়েলী কারাগার থেকে মুক্তি পেলেও ইসরায়েলী বাহিনী তাদের কোন ধরনের উল্লাস করতে দিচ্ছে না। পরিবারের সদস্যরাও বাড়ির বাইরে মুক্তিপ্রাপ্ত সদস্যদের নিয়ে উল্লাস প্রকাশ করলে বাধা দিচ্ছে ইসরায়েলী দখলদার বাহিনী। শুধু তাই নয়, জেনিনসহ পশ্চিমতীরের বিভিন্ন এলাকায় ইসরায়েলী বাহিনীর বর্বর অভিযানও অব্যাহত রয়েছে, তাদের সাথে সমন্বয় করে প্রতিরোধযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছে মাহমুদ আব্বাসের ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষও । পশ্চিম তীরে নিহত-আহতদের সংখ্যা তাই বেড়েই চলছে, যদিও গাযায় প্রায় অর্ধ লক্ষ মৃত্যু এবং লক্ষাধিক আহতের পর এখন যুদ্ধবিরতি চলছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা হতাহতের প্রকৃত সংখ্য আরো বেশি হতে পারে।

যুদ্ধ চলাকালে গত বছর জুলাই মাসে হামাসের সামরিক প্রধান মুহাম্মাদ আল দেইফ নিহত হওয়ার খবর ইসরায়েলী বাহিনী প্রচার করলেও হামাস এ বিষয়ে নীরবতা পালন করে। ইসরায়েলীদের মিথ্যা তথ্য প্রচারের রেকর্ড থাকায় তখন সে খবর পুরোপুরি গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। অবশেষে যুদ্ধবিরতি শেষে আল-কাসসামের মুখপাত্র আবূ উবায়দা মুহাম্মাদ আল-দেইফের শাহাদাতের খবর নিশ্চিত করেন গত ৩০ জানুয়ারি। একই সাথে তিনি আল-কাসসামের উপপ্রধান মারওয়ানর ইশাসহ আরো কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডারের শাহাদতের খবর নিশ্চিত করেন, যারা কি না যুদ্ধ চলাকালে সম্মুখ সমরে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। যদিও তাদের শাহাদাতের পরও যুদ্ধ পরিচালনায় হামাসের কোন ধরনের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়নি বলে মন্তব্য করছেন বিশ্লেষকরা।

জানুয়ারি মাসে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার স্থাপন নিয়ে বেশ উত্তেজনা বিরাজ করে। এমনকি এই উত্তেজনার রেশ ধরে গত ১২ জানুয়ারি ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভর্মাকে তলব করা হলে পরদিন নয়া দিল্লিতে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনারকেও তলব করা হয়। বারবার সীমান্তে পতাকা বৈঠক হয় উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব বৈঠক কোন ফলপ্রসূ সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি। অনেক ক্ষেত্রেই বিগত সরকারের আমলে এক তরফা ভারতের স্বার্থে স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহ বাধা হয়ে দাঁড়ায় বাংলাদেশের সামনে, যার প্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এসব চুক্তি পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলেও জানিয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের এই অবনতির প্রভাব পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের আন্তর্জাতিক বই মেলাতেও। প্রতি বছর মেলাটির অন্যতম আকর্ষণ বাংলাদেশি প্যাভিলিয়ন হলেও এবার মেলায় অংশগ্রহণ করছে না বাংলাদেশ। তাতে হতাশা ব্যক্ত করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বাংলা বইপ্রেমীরা।

এদিকে আগামী ফেব্রুয়ারির ৫ তারিখ ভারতের দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপি রাজধানী দখলের জন্য মরিয়া। কেন্দ্রশাসিত দিল্লির বিধানসভার হাতে তেমন কোন ক্ষমতা না থাকলেও এটি অরবিন্দ কেজরিওয়ালের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া বিজেপির জন্য অনেকটা মর্যাদার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুদূর যুক্তরাজ্যের আরেকটি খবর বাংলাদেশে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে, আর তা হলো পলাতক প্রধানমন্ত্রীর বোনের মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকের যুক্তরাজ্যের সিটি মিনিস্টারের পদ থেকে পদত্যাগ। মূলত খালার শাসনামলে খালার ক্ষমতা ব্যবহার করে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে ব্রিটিশ গণমাধ্যমে তুমুল আলোচনা-সমালোচনার ফলে টিউলিপ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। টিউলিপের অতি ঘনিষ্টজন হিসেবে পরিচিত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমার তার পদত্যাগপত্র গ্রহণও করেন।

জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ খবর হলো– আফগানিস্তানের তালেবানের সর্বোচ্চ নেতা হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা ও প্রধান বিচারপতি আবদুল হাকিম হাক্কানীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির জন্য আবেদন করেছেন আইসিসির প্রধান কৌঁসুলি করিম খান। আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভয়ঙ্কর যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধে কোন ভূমিকা না গ্রহণ করে উলটো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কঠোর সমালোচনা করেছে আফগান সরকার। ফিলিস্তিনের পরিস্থিতি উন্নয়নে আইসিসির কার্যকর ভূমিকা গ্রহণে ব্যর্থতারও সমালোচনা করে আফগান সরকার।

এদিকে গত মাসে বিপ্লবীরা ক্ষমতা দখলের পর জানুয়ারিতে সিরিয়ায় ব্যাপক রদবদল হয়েছে, দেশটির সংবিধান বাতিল করা হয়েছে, বিপ্লবীদের নেতা আবূ মুহাম্মাদ আল জুলানী খ্যাত আহমদ আল শারা প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেছেন, প্রকাশ্যে আসাদপন্থীদের শাস্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে। এরই মধ্যে জানুয়ারির ৩০ তারিখ কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি সিরিয়া সফর করেন এবং আহমদ আল-শারার সাথে সাক্ষাৎ করেন। উপসাগরীয় দেশটির আমিরের সিরিয়া সফর সিরিয়া বিপ্লবী সরকারের প্রতি কাতারসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের সমর্থন এবং পশ্চিমা মৌন সমর্থনের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকগণ।

কবিতা

আদবের সুফল ও বেআদবীর কুফল

মূলঃ মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (র.)

কাব্যানুবাদ: রূহুল আমীন খান

তাওফীক চাই তোমার দ্বারে
শিষ্টাচারের হে মোর রব
তোমার দয়া– ফযল থেকে
বঞ্চিত হয় বে-আদব।

অশিষ্ট– অনিষ্ট-ক্ষতি
করে না কেবল নিজের
বরং সে হয় ক্ষতির কারণ
বিশ্বজগৎ সংসারের।

আকাশ থেকে আসত খাবার
যামানায় হযরত মূসার
চেষ্টা কোশেষ খরিদ ছাড়া
দয়াতে মহান খোদার।

মূসা নবীর কওমে ছিল
ধৃস্ট বেয়াদবের পাল
ভালোটা ত্যাগ করে তারা
বললো কোথা রসুন, ডাল?

বন্ধ হলো নভোরিযিক
আনলো ডেকে সর্বনাশ
ভাগ্যলিপি হলো তাদের
কাস্তে-কোদাল-নাঙ্গল-চাষ।

আমার প্রিয় মাতৃভাষা

আ. শ. ম. বাবর আলী

আমার প্রিয় মাতৃভাষা
নাই তুলনা তার,
বাংলাভাষা আমার আল্লাহর
বিশেষ উপহার।

এই ভাষাতে অনুবাদে
কুরআন-হাদীস বুঝি,
আল্লাহ-নবীর বাণী নিয়ে
শান্তির পথ খুঁজি।

আমার ভাষার শক্তি কত
বিশ্ববাসী জানে,
ভাইরা আমার জীবন দিয়ে
রাষ্ট্রভাষা আনে।

বাংলা আমার মাতৃভাষা
ধর্মীয়ভাষা আরবী.
এরচেয়ে বড় গর্ব কি আর
কইতে কি কেউ পারবি?

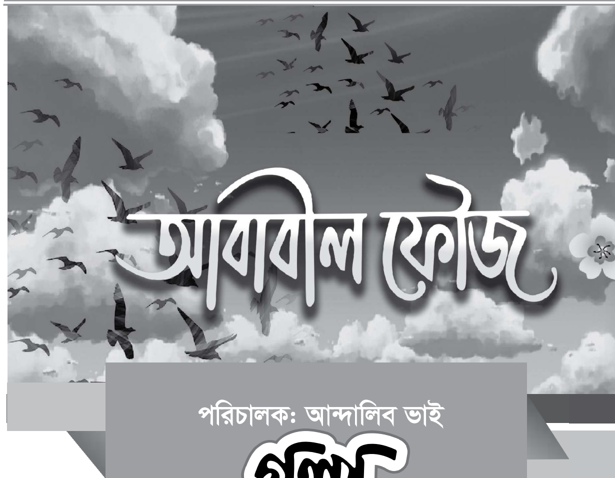

পরিচালক: আন্দালিব ভাই

গল্প

ভিক্ষুক

মুহাম্মাদ উসমান গণি

শান্ত শহর। সবাই বসবাস করছে পরম শান্তিতে। যে সমাজ ছিল লুটতরাজ আর জোর যার মুল্লুক তার কথায় বিশ্বাসী। যে সমাজের মানুষ ভয় আর উৎকন্ঠায় দিনাতিপাত করতো সবসময়। সে সমাজের মানুষ আজ একে অন্যের জন্য জীবনবাজী রেখে বাড়িয়ে দেয় সহযোগিতার হাত। চুরি, ডাকাতি আর লুটতরাজ ভুলে গিয়ে সবাই পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করাকে সর্বোচ্চ সম্মানের জায়গা মনে করতে শুরু করলো। খেটে খাওয়া মানুষকে সম্মানের আসনে সমাসীন করলেন আরবের নবী, করুণার ছবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি জানতেন, পরিশ্রম করা ছাড়া জীবনে উন্নতি করা যায় না। তাই পরিশ্রম করাকে তিনি খুব গুরুত্ব দিতেন।

একদিনের ঘটনা। ছেঁড়া কাপড় পরনে এক মধ্য বয়সি বেদুঈন লোকের আগমন। ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দিলো নবীজির দিকে। নবীজী তাকিয়ে দেখলেন লোকটির চোখে-মুখে বেদনার ছাপ। লোকটি পঙ্গু বা বুড়ো নয়, সুঠামদেহী ও সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন। ইচ্ছে করলেই কাজ করে খেতে পারে। তিনি বললেন,তুমি ভিক্ষা করছো কেন? চাইলে তো কাজ করতে পারো।

লোকটি বলল, কী করবো হে আল্লাহর রাসূল! কাজ পেলে কি আর ভিক্ষা করি? আজ তিনদিন চলছে ঘরে আমার স্ত্রী সন্তানেরা না খেয়ে আছে। পেটের দায়েই ভিক্ষায় নেমেছি। লোকটির কথা শুনে রাহমাতুল্লিল আলামীনের হৃদয়টা নাড়া দিয়ে ওঠলো। মায়ার নযরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন লোকটির দিকে। লোকটির জন্য পরম মমতায় পূর্ণ হয়ে গেলো নবীজির হৃদয়খানি। তিনি ভাবলেন তাকে কীভাবে সাহায্য করা যায়।

ভাবলেন, সাহায্য দিলে হয়তো একবেলা তাঁর আহার জুটবে। কিন্তু তারপরতো আবারও অন্যের কাছে হাত পাততে যাবে। তাহলে সারাজীবন লোকটি ভিক্ষা করে কাটাবে? তার জন্য এমন কিছু করা দরকার যাতে করে তার স্থায়ীভাবে অভাব দূর হয়ে যায়। আর যেনো মানুষের কাছে হাত পেতে অপমান সইতে না হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার বাড়িতে কি এমন কিছু আছে যা বিক্রি করা যাবে?

লোকটি বলল,নবী!আমি গরীব মানুষ। তেমন কিছুই নেই। তবে ঘরে সম্বল হিসেবে একটি কম্বল আছে, চাইলে ওটা বিক্রি করে দিতে পারবেন।

নবীজি বললেন,ঠিক আছে, তাই করো। তোমার একমাত্র সম্বলটাই নিয়ে এসো।

লোকটি নবীর কথা মতো চলে গেল বাড়ি। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো কম্বল নিয়ে। নবীজি কম্বলটি সাহাবীদের দেখালেন। বললেন,এটি বিক্রি হবে। কেউ কি উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কম্বলটি কিনতে রাজি আছো? নবীজির কথা শুনে এক সাহাবী বললেন, কম্বলখানা আমি কিনতে চাই, হে আল্লাহর হাবীব।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীর কাছে উপযুক্ত দামে কম্বলটি বিক্রি করে দিলেন। কম্বল নিয়ে সাহাবী চলে গেলে নবীজি লোকটিকে ডাকলেন। তাঁর হাতে কিছু অর্থ তুলে দিয়ে বললেন,এই অর্থ দিয়ে কিছু খাবার কিনে নিয়ে যাবে তোমার স্ত্রী-সন্তানের জন্য। এরপর বাকি অর্থ দিয়ে নবীজি একটি কুঠার কিনলেন। সেই কুঠারে নিজেই হাতল লাগালেন। লোকটিকে বললেন,এই কুঠার নিয়ে প্রতিদিন বনে যাবে। বন থেকে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করবে। আশা করি আল্লাহ তোমার রিযকে বারাকাহ দান করবেন।

লোকটি তাই করলো। সে প্রতিদিন বন থেকে কাঠ কেটে সেই কাঠ বাজারে বিক্রি করতে থাকলো। এতে তাঁর খুব লাভ হলো। তাঁর অভাব দূর হয়ে গেল। এখন আর তাঁকে ভিক্ষা করতে হয় না; বরং অভাবী মানুষকে নিজেই সাহায্য করতে পারে।

কিছুদিন পর। সে মহানবীর সঙ্গে আবার এসে দেখা করলো। এবার তাঁর গায়ে নতুন জামা। মুখে হাসি। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আমি এখন মেহনত করে খাই। আমার আর কোন অভাব নেই। আপনার দেওয়া উপদেশ আমার ভাগ্যের দরজা খুলে দিয়েছে। আপনি আমাকে সুন্দর জীবনের পথ দেখিয়েছেন। আজ আমি সুখী মানুষ। স্ত্রী সন্তান নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি।

তাঁর কথা শুনে নবীজি খুব খুশি হলেন। বললেন, যে মেহনত করে খায় আল্লাহই তাঁকে সাহায্য করেন। কবি **শেখ হাবিবুর রহমান তার কবিতায় সুন্দরভাবে বলেছেন,**

অভাব তাহার রহিল না আর, হইল সে সুখী ভবে
নবীর শিক্ষা করো না ভিক্ষা, মেহনত কর সবে। প

ইবরাহীম (আ.) ও নমরূদের বিতর্ক

জামান আহমদ

হযরত ইবরাহীম (আ.) এর যুগে লোকেরা বিভিন্ন মূর্তির পূজা করতো। তিনি সেটার ঘোর বিরোধিতা করেন এবং মানুষদেরকে তাওহীদ তথা এক আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেন। লোকেরা তার সেই দাওয়াতে বিরক্ত হয়ে এক সময় তাকে বিশাল অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিয়েছিল। কুরআনে সে ঘটনা উল্লেখ আছে। তারা বললো, তাকে আগুনে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের দেব-দেবীদেরকে সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৬৮)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেই বিশাল অগ্নিকুণ্ড-কে ইবরাহীম (আ.) এর জন্য শান্তির আশ্রয়স্থল বানিয়ে দিয়েছিলেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, আমি (আল্লাহ) বললাম, হে আগুন, তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৬৯)

সেই যুগে যে বাদশাহ ক্ষমতায় ছিলো তার নাম নমরূদ। তাফসীরে পাওয়া যায় তার পুরো নাম ছিল নমরূদ বিন কিনআন বিন কাউস বিন শাম বিন নূহ। এমন চারজন পরাক্রমশালী বাদশাহ পৃথিবীতে ছিলেন যারা পুরো পৃথিবী শাসন করেছেন। তন্মধ্যে দুইজন বাদশাহ মুমিন এবং দুইজন ছিলো কাফির। মুমিন বাদশাহ দুইজন হলেন হযরত সুলাইমান (আ.) ও বাদশাহ যুলকারনাইন। কাফির দুইজন হলো নমরূদ এবং বখতে নাসর। এই চারজন মানুষ আলাদা আলাদা সময়ে পুরো পৃথিবীর উপর রাজত্ব করেছিলেন। কারও কারও মতে নমরূদ দীর্ঘ চারশত বছর শাসনকার্য চালিয়েছে। নমরূদের রাজধানী ছিল বর্তমান ইরাকের ব্যাবিলন বা বাবিল শহরে।

মিনহাল ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, ইবরাহীম (আ.) সেই অগ্নিকুণ্ডে চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ দিন ছিলেন। আল্লাহ তাআলার কুদরতে সেই বিশাল অগ্নিকুণ্ড থেকে বের হয়ে আসার পর তিনি খাদ্যশস্য আনার জন্য বাবিল শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। কেননা তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল এবং নমরূদের কাছে সমৃদ্ধ খাদ্যভাণ্ডার ছিল। হযরত সুদ্দী (র.) বলেন, এর আগে কখনো ইবরাহীম (আ.) এর সাথে নমরূদের সাক্ষাৎ হয়নি। আবার কেউ কেউ বলেছেন, নমরূদের নির্দেশে ইবরাহীম (আ.)-কে অগ্নিকুণ্ডে ফেলা হয়েছিল। যাইহোক, সুদীর্ঘ সময় ধরে পুরো পৃথিবীতে রাজত্ব করার ফলে নমরূদের মস্তিষ্কে ঔদ্ধত্য, আত্মম্ভরিতা, অবাধ্যতা, অহংকার ঢুকে পড়েছিল, ফলে সে নিজেকে খোদা হিসেবে দাবি করে। যেভাবে হযরত মূসা (আ.) এর যুগে ফিরআউন ক্ষমতার অহমিকায় অন্ধ হয়ে মানুষদের একত্রিত করে নিজের খোদায়ী ঘোষণা করেছিল। কুরআনে এসেছে, অতঃপর সে সকলকে সমবেত করলো এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা দিল, আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক। (সূরা নাযিআত, আয়াত ২৩-২৪)

ইবরাহীম (আ.) সেখানে গিয়ে জানতে পারলেন নমরূদ নামক ব্যক্তি নিজেকে খোদা দাবি করে মানুষকে তার গোলাম বানিয়ে রেখেছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) নমরূদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তাকে একত্ববাদ তথা এক খোদার প্রতি ঈমান আনার জন্য আহ্বান করলেন। সে বললো, তোমার খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ কী? ইবরাহীম (আ.) বললেন, আমার খোদা হচ্ছেন সবার পালনকর্তা, তিনি জীবনদান করেন এবং সেই জীবনের মৃত্যুও ঘটান। নমরূদ বললো, আমিও তো জীবনদান করতে পারি এবং মৃত্যু ঘটাতে পারি। অতঃপর সে কয়েদখানা থেকে দুইজন লোককে এনে একজনকে হত্যা করলো অপরজনকে মুক্ত করে দিলো। এই হত্যা ও মুক্তিকে সে যথাক্রমে মৃত্যুদান ও জীবনদান বলে অভিহিত করতে চাইলো। অথচ, আল্লাহ তাআলা অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্ব দেন এবং আবার সেই অস্তিত্বের মৃত্যু ঘটান। ইবরাহীম (আ.) এর সামনে নমরূদ এই ঘটনা ঘটিয়ে বোকার মতো বুঝাতে চাইলো সে-ই জীবন-মৃত্যুর মালিক। তার এই কার্যকলাপ যে কত অসার, অবাস্তব ও হাস্যকর তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।। কেননা, হযরত ইবরাহীম (আ.) এর দাবি ও নমরূদের দাবি সম্পূর্ণ বিপরীত ও সামঞ্জস্যহীন। নমরূদের এহেন কাজ দেখে ইবরাহীম (আ.) সহজেই আন্দাজ করে ফেললেন নমরুদের বুদ্ধির দৌড় কতটুকু। এবার হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, আমার খোদা সূর্যকে পূর্ব দিকে উদিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই সূর্য প্রতিদিন পূর্ব দিক থেকে উদিত হয়। তুমিও তো নিজেকে খোদা দাবি করো, তাহলে তুমি সূর্যকে নির্দেশ দাও যেন পশ্চিম দিক থেকে উদিত হয়! একথা শুনে নমরূদ হতভম্ব হয়ে গেল। এর উত্তরে সে আর কোনো কথা-ই বলতে পারলো না। এমনকি ভাঙাচুরা কোনো উত্তরও দিতে পারলো না। বাধ্য হয়ে অপারগতা স্বীকার করলো কিন্তু ক্ষমতার লোভ তাকে সুপথে আসতো দিলো না। এইরূপ সীমালঙ্ঘনকারী লোকদের অন্তরে মোহর মারা, তাই তারা চোখের সামনে দেখা সত্যকেও আলিঙ্গন করতে পারে না। হিদায়াতের নূরের পরশ তারা পায় না। আল্লাহ তাআলা তাদের উপর ক্রোধান্বিত ও অসন্তুষ্ট হতে হতে এক সময় এমন আযাব নাযিল করেন, যা থেকে রক্ষা পাওয়ার আর কোনো সুযোগ অবশিষ্ট থাকে না।

তর্ক শাস্ত্রবিদগণ বলেন, ইবরাহীম (আ.) এর প্রথম দাবিটি ছিল দ্বিতীয় দাবির ভূমিকা স্বরূপ। দ্বিতীয় যুক্তি বা দাবি প্রথমটির চাইতে খুবই উজ্জ্বল ও দীপ্যমান। উভয়টিই নমরুদের যুক্তির অসারতা প্রমাণে পরস্পর সহায়ক ছিল। কুরআনে আল্লাহ পাক ইবরাহীম (আ.) ও নমরূদ এই বিতর্কের ঘটনা উল্লেখ করেছেন এভাবে, তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখো নাই, যে ইবরাহীম (আ.) এর সঙ্গে তার প্রতিপালকের সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব দান করেছিল। যখন ইবরাহীম (আ.) বললেন, তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবনদান করেন ও মৃত্যু ঘটান, সে বললো, আমিও তো জীবনদান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইবরাহীম (আ.) বললেন, আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করান, তুমি সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করাও। অতঃপর যে কুফরী করেছিল সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৮)

এরপর আল্লাহ পাক একজন ফেরেশতার মাধ্যমে নমরূদকে ঈমান আনয়নের দাওয়াত দিলে সে তা প্রত্যাখ্যান করলো। দ্বিতীয়বার দাওয়াত দেওয়ার পরও যখন সে প্রত্যাখ্যান করলো তখন ফেরেশতা বললেন, তুমি তোমার সেনাবাহিনী প্রস্তুত করো আমিও আমার বাহিনী নিয়ে আসতেছি। অতঃপর নমরূদ তার বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে সূর্যোদয়ের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলো। আল্লাহ পাক দলে দলে মশা পাঠিয়ে দিলেন। এতো বেশি মশা উপস্থিত হলো যে, সূর্য জনগণের দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়। সেই মশাদের আক্রমণে নমরূদের বিশাল বাহিনী জায়গাতেই নাস্তানাবুদ হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা একটি মশাকে নমরূদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। মশাটি তার মগজে ঢুকে যখন কামড় দিতো তখন অসহ্য যন্ত্রণা হতো। সেই অসহ্য যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নমরূদ উন্মাদের মতো প্রাচীরের দেয়ালে, পাথরে, উপর্যুপরি মাথায় আঘাত করতো। এভাবে করেই ধীরে ধীরে পুরো পৃথিবী শাসনকারী পরাক্রমশালী বাদশাহ পাপাত্মা নমরূদের জীবনলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়।

যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে দ্বীন
এস এম মনোয়ার হোসেন

যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে দ্বীন বিশ্বজুড়ে যার শান ও মান
মুহাদ্দিস ছাহেব হযরত আল্লামা হবিবুর রহমান।
তাঁর সুহবতে কত আলিম পেয়েছেন হাদীসের জ্ঞান
সব মহলে প্রিয় তিনি, সুনাম ছিলো তাঁর অফুরান।
ইলম ও আমলে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, ছিলেন দ্বীনের দাঈ
মুরশিদ ফুলতলীর ফয়েজ লাভে করেছেন বাদশাহী।
স্বীয় মুর্শিদের প্রতি ছিলো যে তাঁর অগাধ সম্মান
তালিম-তরবিয়াত খানকাঘরে পেয়েছি তার প্রমাণ।
কোমল হৃদয় সিক্ত ছিলো নূর নবীজির প্রেমে
বয়সের ভীড়েও তা একটুখানি যায়নি থেমে।
শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অটুট আজও শিরতাজের প্রতি
একটু হলেও এ অধম চাই তাঁর ইলমের জ্যোতি।

রাষ্ট্রভাষা বাংলা
জামান আহমদ

রাষ্ট্রভাষা বাংলা বলে দিলো যারা স্লোগান
পাক হানাদার নিষ্ঠুরেরা কাড়লো তাদের প্রাণ
রক্তে লাল হয়েছিল সেদিন আমার ভাই
তাদের তরে আজও মোরা প্রাণভরে গান গাই।

জন্ম থেকেই মায়ের মুখে শুনেছি যে ভাষা
প্রাণ দিয়েছে রফিক-সালাম বুকে নিয়ে আশা
বাংলা থাকবে হৃদয়জুড়ে এইটুকু চাওয়া
বাংলায় লেখি ছড়া-কবিতা,বাংলাতেই গাওয়া।

বাংলা হলো প্রাণের ভাষা হৃদয়ের আবেগ
একুশ এলে বাংলা গগনে জমে ওঠে মেঘ
ভাষা শহীদদেরকে আমরা করে যাবো স্মরণ
অক্ষয়,অমর,অম্লান তারা থাকবে আজীবন।

ইলমে হাদীসের তারকা তুমি
আলিম উদ্দিন আলম

ধন্য তোমার জীবন ওগো
ছিলে তুমি কত সুমহান
ইলমে হাদীসের তারকা তুমি
আল্লামা হবিবুর রহমান।

ইলমে দ্বীনের আলোকিত মুখ
শিক্ষাদানে তুমি পেয়েছিলে সুখ
সারটি জীবন ওগো দ্বীনের পথে
রেখে গেছো তুমি কত অবদান
আল্লামা হবিবুর রহমান।

অটুট ছিলে ন্যায় নীতির পথে
বিচারক হলে আরব আমীরাতে
লাখো মানুষের প্রাণের প্রিয়
ইতিহাসে আছো তুমি চির অম্লান
আল্লামা হবিবুর রহমান।।

পরওয়ানা
মাহবুবুর রহমান শাহান

পরওয়ানা যখন বের হয়েছে
খুশি হলাম ভাই
আনন্দময় জীবন হোক
এটা মোরা চাই।
আত্মার খোরাক মেটাতে ভাই
পড়ুন মাসিক পরওয়ানা
সর্বক্ষেত্রে জ্ঞান আহরণের
পত্রিকাটি অনন্যা।
বাদ ফজরে চায়ের চুমুক
সাথে থাকবে পরওয়ানা
সূক্ষ থেকে বিশাল বিষয়
অজানাকে হবে জানা।
পরওয়ানা হোক সবার শীর্ষে
এটা মোরা চাই
সুখে দুঃখে সবসময় যেন
পরওয়ানাকে পাই।

তালামীযের সৈন্য
মোহাম্মদ ইউসুফ সাঈম

তালামীযের সৈন্য মোরা
দুঃখীজনের বন্ধু বেশ
সরল পথের পথিক হলাম
অন্তরে নেই হিংসা-দ্বেষ।

যাত্রা পথে কষ্ট যতই
আসলে তবু অটুট তাই
কর্মে সদা সফলতা
রহমতে রব আমরা পাই!

সম্বল আছে মোদের কাছে
রব ও রসুলের করম
তাই তো ছুটি বীর গতিতে
পাই দিলে শান্তি পরম!

নম্রতা আর ভদ্রতাতে
জয় করি সবার হৃদয়,
আসলে আঁধি তাকত আছে
হিয়ার মাঝে নাই কো ভয়!

ঝড়-বাতাসে জোট বেঁধে সব
সামলে নিতে তৈরি যে
নেই প্রয়োজন কৃপাণপাণি
বারুদ-কামান হই নিজে!!

সাধ্যমতো চেষ্টা চালাই
ছড়ায় দিতে সেবার হাত
ইনশাআল্লাহ বহাল রবে
মুর্শিদের এ আমানাত।

করতে কায়িম ধরার বুকে
সুন্নত মাদীনাওয়ালার
বের হয়েছি এই পথে তব
সাহায্য চাই রব-আলার।

কারলো কবুল হামে, ইয়া রব!
ওয়াসিলা আপ কা ওলী
জিসনে হামে এক বানায়া
ও হযরতে ফুলতলী!

জাহান্নামের বর্ণনা এবং এর দরজাসমূহ

পবিত্র কুরআন কারীমে এবং হাদীস শরীফে জাহান্নামের বর্ণনা এসেছে। জাহান্নামের দরজার বিবরণও এসেছে। কিয়ামতের দিন জান্নাতীদের জন্য জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করা হবে এবং জাহান্নামীদের জন্য জাহান্নামের দরজা খোলা হবে। নিম্নে পবিত্র কুরআনের আলোকে জান্নাত ও জাহান্নামের দরজার বিবরণ তুলে ধরা হলো—

জাহান্নামের দরজা সাতটি

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, অবশ্যই জাহান্নাম তাদের সবারই প্রতিশ্রুত স্থান। তার সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক শ্রেণি আছে। (সূরা হিজর, আয়াত: ৪৩-৪৪)

জাহান্নামের সাত দরজার নাম

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, জাহান্নামের সাতটি দরজা হলো— জাহান্নাম, সায়ির, লাযা, হুতামা, সাকার, জাহীম ও হাবিয়া। (তাফসীরে ইবন আবী হাতিম, পৃষ্ঠা-২২৬৫)

প্রত্যেক শ্রেণির জন্য পৃথক দরজা

নিজেদের আমল অনুসারে জাহান্নামি ব্যক্তিরা জাহান্নামের পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আল্লাহ বলেন, তার (জাহান্নামের) সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক শ্রেণি আছে। (সূরা হিজর, আয়াত-৪৪)

জাহান্নামীরা প্রবেশ করতে চাইবে না

জাহান্নামীরা জাহান্নামে স্বেচ্ছায় প্রবেশ করবে না; বরং তাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। ইরশাদ হয়েছে, 'অবিশ্বাসীদের জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (সূরা যুমার, আয়াত-৭১)

দলে দলে প্রবেশ করানো হবে

জাহান্নামীদের দলে দলে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। ইরশাদ হয়েছে, অবিশ্বাসীদের জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (সূরা যুমার, আয়াত-৭১)

প্রবেশের সময় ভর্ৎসনা

জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশের সময় জাহান্নামীদের ভর্ৎসনা করা হবে। ইরশাদ হয়েছে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূল আসেননি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করত এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করত? (সুরা যুমার, আয়াত-৭১)

চিরদিনের জন্য প্রবেশ

অবিশ্বাসীরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে চিরদিনের জন্য প্রবেশ করবে। আর পাপী মুমিনরা শাস্তি ভোগ করে তা থেকে বের হয়ে আসবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, তাদের বলা হবে, জাহান্নামের দরজাগুলোতে প্রবেশ করো তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য। উদ্ধতদের আবাসস্থল কতইনা নিকৃষ্ট ! (সূরা যুমার, আয়াত-৭২)

শাস্তির সময় দরজা বন্ধ থাকবে

জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশের পর তার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ইরশাদ হয়েছে, আর যারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাই হতভাগ্য। তারা পরিবেষ্টিত হবে অবরুদ্ধ আগুনে। (সূরা বালাদ, আয়াত: ১৯-২০)

যে সময় জাহান্নামের দরজা বন্ধ থাকে

আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন রামাদান আগমন করে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৩২৭৭)

গ্রন্থণাঃ মোহাম্মদ সিদ্দীক হায়দার

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবী শব্দ

১৩৮. طَرَفٌ (তারাফ): বাংলারূপ **তরফ**। পার্শ্ব, পক্ষ, অংশ, দিক, Side। যেমন- বাদীর তরফ, কনের তরফ।

১৩৯. طَرْفَةٌ (তারফাহ): বাংলারূপ **তরফা**। একঘেঁষা, Glance, একতরফা।

১৪০. طَرِيْقَةٌ (তারীকাহ): বাংলারূপ **তরিকা/তরিকত**। পথ, পদ্ধতি, Rule।

১৪১. طَوَافٌ (তাওয়াফ): বাংলারূপ **তওয়াফ**। ঘুরা, প্রদক্ষিণ করা, কাবার চার পার্শ্বে ঘুরে ঘুরে প্রার্থনা করা, Visiting।

১৪২. طَبِيْعَةٌ (তাবীআহ): বাংলারূপ **তবিয়ত**। প্রকৃতি, অভ্যাস, Nature।

গ্রন্থনা: মোহাম্মদ খছরুজ্জামান

আন্দালিব ভাই সমীপে...

প্রিয় আন্দালিব ভাই

প্রতি মাসের প্রথম তারিখে যখন পরওয়ানা হাতে পাই তখন খুব ভালো লাগে। অল্প সময়ে পরওয়ানা পাঠকদের হাতে পৌঁছানোর জন্য পরওয়ানা পরিবারকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

মো. রিফাত
বোয়ালিয়া, রাজশাহী

-আন্দালিব ভাই

পরওয়ানা পেয়ে তোমার ভালো লাগা শুনে আমরাও আনন্দিত হলাম। তোমাদের নিয়মিত অংশগ্রহণ থাকলে আবাবীল ফৌজ আরও নিত্য নতুন জিনিস নিয়ে হাজির হবে ইন শা আল্লাহ। ভালো থাকবে সে প্রত্যাশা করছি।

প্রিয় আন্দালিব ভাই

পরওয়ানা নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে জেনে খুব খুশি হলাম। আনন্দিত হয়েছি প্রিয় আবাবীল ফৌজ আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে জেনে। আবাবীল ফৌজে আমরা নিত্য নতুন বিষয় জানতে পারবো আশা করছি। আবাবীল ফৌজের সকল সদস্যের জন্য শুভকামনা।

মাহফুজুর রহমান রিফাত
আনন্দনগর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, রামপুরা, ঢাকা

-আন্দালিব ভাই

তোমার চিঠির জন্য অনেক ধন্যবাদ। তোমাদের অংশগ্রহণে আবাবীল ফৌজ হবে আরও সমৃদ্ধ। তোমার ভালো লেখাটি এখনই পাঠিয়ে দাও আবাবীল ফৌজের ঠিকানায়।

প্রিয় আন্দালিব ভাই

পরওয়ানা তুমি আসবে বলে অপেক্ষার প্রহর গুনছি। তুমি কবে আসবে বলোতো? এতো দেরি করলে কি হয় বলো? খুব তাড়াতাড়ি এসো। শীতের সকালে বারান্দায় বসে প্রিয় পরওয়ানা পড়তে চাই।

সাফওয়ান আহমদ
কবিরাজপুর, রাজউক, মাদারীপুর

-আন্দালিব ভাই

এইতো আমি চলে এলাম। এবার খুশিতো? হুম; শীতের সকালে হালকা রোদে বসে রোদ পোহাবার মজাই আলাদা। আর তখন যদি পাশে থাকে প্রিয় পরওয়ানা তাহলেতো কথাই নেই। তবে হ্যাঁ, শীতের পিঠাপুলির দাওয়াত যেনো পাই, কেমন?

প্রিয় আন্দালিব ভাই

আমি নবম শ্রেণিতে পড়ি। পরওয়ানার সাথে আমার নতুন পরিচয় হলো। সংখ্যাটি অসাধারণ হয়েছে। আবাবীল ফৌজের লেখাগুলো খুবই চমৎকার লেগেছে। গল্প, কবিতা, শব্দকল্প ও বর্ণকল্প সব মিলিয়ে অসাধারণ। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এরকম সুন্দর জিনিস উপহার দেওয়ার জন্য।

তাবীব হাসান
সিলেট ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এণ্ড কলেজ, সিলেট

-আন্দালিব ভাই

তোমাকে পরওয়ানা পরিবারে স্বাগতম। তোমাদের অংশগ্রহণ নিয়মিত হলে অবশ্যই এরকম নিত্যনতুন বিষয় নিয়ে প্রতিমাসে হাযির হবো তোমাদের কাছে। চিঠির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

প্রিয় আন্দালিব ভাই

আমি জনপ্রিয় ম্যাগাজিন মাসিক পরওয়ানার একজন নিয়মিত পাঠক। এ ম্যাগাজিনের সব বিভাগই আমাকে মুগ্ধ করে। বিশেষ করে আবাবীল ফৌজের বলতো দেখি, শব্দকল্প আমাকে খুব আনন্দ দেয়। আমি পরওয়ানার উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি।

তামান্না ইয়াসমীন
বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল, শাহজালাল উপশহর, সিলেট

-আন্দালিব ভাই

পরওয়ানার নিয়মিত পাঠক হিসেবে তোমাকে স্বাগতম। পরওয়ানার সকল বিভাগ তোমার ভালো লাগে শুনে খুশি হলাম। আর আবাবীল ফৌজতো তোমাদেরই বিভাগ। এ বিভাগকে সুন্দর করতে তোমাদের বেশি বেশি অংশগ্রহণ চাই। লিখবে নিয়মিত। তোমার বন্ধুদেরও পরওয়ানার পাঠক বানাতে ভুলবে না।

সদস্য কুপন

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি 'আবাবীল ফৌজ' এর সদস্য হতে চাই। আমার বয়স ১৬ বছরের বেশি নয়। আমি ফৌজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজেকে সচেষ্ট রাখবো।

নাম: --

পিতা/অভিভাবক: --

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ------------------------------------ শ্রেণি: ------------

গ্রাম: ------------------------ ডাক: ------------------------

থানা: ------------------------ জেলা: ------------------------

কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে নিচের ঠিকানায় অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠিয়ে দাও।

আন্দালিব ভাই
পরিচালক, আবাবীল ফৌজ
মাসিক পরওয়ানা
বি.এন টাওয়ার, ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন ৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট সিলেট-৩১০০
Mobile: 01799 629090, E-mail: parwanaafbd@gmail.com

আন্দালিব ভাইয়ের চিঠি

সুপ্রিয় বন্ধুরা!

কেমন আছো তোমরা?

নিশ্চয়ই ভালো আছো। আমরাও ভালো আছি। নিশ্চয়ই তোমরা নতুন ক্লাসের বই পেয়ে খুব খুশি মনে নতুন ক্লাসের পড়াশোনা শুরু করে দিয়েছো। নতুন বই পড়া আসলেই খুব মজার। এই বছর নতুন বই সংস্করণ হয়েছে। তবে যারা এখনো সবগুলো বই হাতে পাওনি তারা অনলাইনে পিডিএফ ফাইল পেয়ে যাবে। আপাতত পিডিএফ থেকেই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে। তারপরও সময় অযথা নষ্ট করা যাবে না।

প্রিয় বন্ধুরা!

চলছে ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি। ৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির সংগ্রাম কেবলমাত্র বাংলা ভাষায় সংগ্রাম ছিল না। এ সংগ্রাম ছিল সারা দেশে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ও বাংলা ভাষীদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দিবস। বাংলা ভাষা আমাদের অনির্বাণ অগ্নি; ওই শিখা থেকে আগুন সংগ্রহ করতে হয় আমাদের সবসময়। এ দেশে সকল আন্দোলনের সঙ্গেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে বাংলা ভাষা ও একুশ; এই মশাল থেকে আগুন নিয়েই জ্বালিয়ে দিতে হয় প্রতিক্রিয়াশীলতার সমস্ত দুর্গ।

একুশের চেতনা নিয়ে আমরা দেশ গড়ার অঙ্গীকার নিতে হবে। তোমাদের সকলের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা করে এখানেই বিদায় নিলাম।

ইতি

তোমাদেরই আন্দালিব ভাই

বলতো দেখি?

এ সংখ্যার প্রশ্ন

১. তাফসীরে মাযহারীর প্রণেতা কে?
২. আল মুসান্নাফ কার লেখা?
৩. কোন দুজন মুসলিম শাসক পুরো পৃথিবী শাসন করেছিলেন?
৪. আল্লামা হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস (র.) এর ওফাত বার্ষিকী কবে?
৫. ইমাম আবূ হানীফা (র.) কবে জন্মগ্রহণ করেন?

গত সংখ্যার উত্তর

১. ১৯৭৫ সালে
২. ১৯২০ সালে
৩. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)
৪. Deoxyribonucleic acid
৫. ১৩৭৭ হিজরী

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে [প্রথম তিনজন পুরস্কৃত]

জাহেদা আক্তার (শবনম), নিজ ঢাকাদক্ষিণ, মুন্সিপাড়া, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # মোঃ হারুনুর রশীদ, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # মোহাম্মাদ আজিজুর রহমান, ব্রাহ্মণবাজার, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আব্দুল্লাহ আল হোসাইন, জালালপুর,দক্ষিণ সুরমা,সিলেট # রাহীন আহমদ সালেহ, দক্ষিণ রাইগদাড়া, ওসমানীনগর, সিলেট # সাব্বির আহমদ, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # মোঃ কামরুল হাসান, বারহাল হাটুবিল গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, বারহাল, জকিগঞ্জ, সিলেট # মোঃ নাজমুল ইসলাম,বারহাল হাটুবিল গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, বারহাল, জকিগঞ্জ, সিলেট # শরিফ আহমদ সাব্বির, হাউসা, বলাউরা বাজার, জালালাবাদ, সিলেট সদর, সিলেট # হাফিয মো. আশরাফুল ইসলাম, দক্ষিণভাগ, ভাটেরা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # হুমায়রা হোসেন সুমাইয়া, জাহানারা চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষিপাশা, চরমহল্লা, ছাতক, সুনামগঞ্জ # আব্দুস সামাদ, ফেঞ্চুগঞ্জ মোহাম্মদিয়া কামিল মাদরাসা,ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট # মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, গাজীপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # তানজিনা রহমান ইমরা, হলিয়ারপাড়া সুন্নিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # তাসলিমা আক্তার, আল আমিন নার্সিং কলেজ, শাহজালাল উপশহর, সিলেট # জাসলিমা আক্তার, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # নূর আহমদ রাহাত, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # আহসানা জান্নাত, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # রাশেদ আহমদ, হাসিমপুর আহমদিয়া দাখিল মাদরাসা, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আবু সাঈদ মাইন, ফরিদপুর, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # রেদওয়ান আহমদ রমজান, গোটারগ্রাম ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদরাসা, বালাউট, জকিগঞ্জ, সিলেট।

শব্দকল্প

১		২		
				৩
৪	৫			
			৬	
৭				
৮			৯	

সূত্র : পাশাপাশি

১। মায়ের ভাষা ৪। ধোপা ৬। মৃতদেহ ৭। আমার ৮। অতীত ৯। প্রভাত।

সূত্র : উপর-নীচ

১। মনীষীদের সমাধীস্থল ২। এক প্রকার বণ্য প্রাণী ৩। বরকতময় রজনি ৫। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অভিমত ৭। তরল পদার্থ রাখার হাতল বিশিষ্ট পাত্র।

গত সংখ্যার সমাধান

ঈ	সা	লে	সা	ও	য়া	ব
মা				ম		হা
ন		দ		রা	সু	ল
		র	ব		ল	
ঈ	দ	গা	হ		তা	র
	শ	হ	র		ন	

গত সংখ্যার শব্দকল্পের পরিকল্পনাকারী
মো. নাছির উদ্দিন তালহা
হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট

শব্দকল্পে যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে (প্রথম তিনজন পুরস্কৃত)

জামিয়া আক্তার, দিনারপুর ফুলতলী গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # আশিকুর রাহমান, হাজী মাহমুদ আলী দাখিল মাদরাসা, জুড়ী,মৌলভীবাজার # মোঃ সালাহ উদ্দিন আল বেলাল, জালালপুর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # মো নিজাম উদ্দিন, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ সিলেট # সাব্বির আহমদ, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # মো. সুজন আহমদ, হাজী আসমত সরকারি কলেজ, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ # কাজী মোঃ জাকির হোসেন, হবিগঞ্জ জজ কোর্ট, হবিগঞ্জ # মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, গাজীপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # জাহেদা আক্তার (শবনম), নিজ ঢাকা দক্ষিণ, মুন্সিপাড়া, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # সায়মা বেগম, তৈবুন্নেছা খানম সরকারি কলেজ, জুড়ী, মৌলভীবাজার # হুমায়রা হোসেন সুমাইয়া, জাহানারা চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষিপাশা, চরমহল্লা, ছাতক, সুনামগঞ্জ # রাশেদ আহমদ, হাসিমপুর আহমদিয়া দাখিল মাদরাসা, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আহসানা জান্নাত, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # হাফিজুর রহমান, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # আবু সাঈদ মাইন, ফরিদপুর, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মাহবুবা জান্নাত সামিয়া, ছকাপন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার রেদওয়ান আহমদ রমজান, গোটারগ্রাম ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদরাসা, বালাউট, জকিগঞ্জ, সিলেট।

বর্ণকল্প

এ সংখ্যার বর্ণকল্প

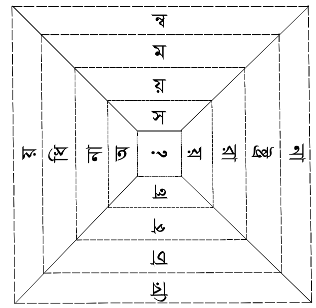

বর্ণগুলো এলোমেলো আছে। এগুলো সাজিয়ে কেন্দ্রের ফাঁকা ঘরে একটি মাত্র বর্ণ বসালে চারটি অর্থবোধক শব্দ তৈরি হবে। চেষ্টা করে দেখতো অর্থসহ শব্দ চারটি তৈরি করতে পারো কি না! সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে।

গত সংখ্যার সুডোকুর সমাধান

4	2	1	3
3	1	2	4
2	4	3	1
1	3	4	2

গত সংখ্যার বর্ণকল্পের পরিকল্পনাকারী
আজিম উদ্দিন মাছুম
হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে

মো. সুজন আহমদ, হাজী আসমত সরকারি কলেজ, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ # জাহেদা আক্তার (শবনম, নিজ ঢাকাদক্ষিণ, মুন্সিপাড়া, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # মোঃ নাজমুল হাসান, বারহাল হাটুবিল গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, বারহাল, জকিগঞ্জ, সিলেট # জামিয়া আক্তার, দিনারপুর ফুলতলী গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # আশিকুর রাহমান, হাজী মাহমুদ আলী দাখিল মাদরাসা, জুড়ী,মৌলভীবাজার # মোঃ সালাহ উদ্দিন আল বেলাল, জালালপুর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # মো নিজাম উদ্দিন, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # সাব্বির আহমদ, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # মো. সুজন আহমদ, হাজী আসমত সরকারি কলেজ, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ # কাজী মোঃ জাকির হোসেন, হবিগঞ্জ জজ কোর্ট, হবিগঞ্জ # মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, গাজীপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # শরিফ আহমদ সাব্বির, হাউসা,বলাউরা বাজার,জালালাবাদ,সিলেট সদর,সিলেট # আব্দুল হাকিম, তাজপুর, ওসমানীনগর, সিলেট # হাফিয মো. আশরাফুল ইসলাম, দক্ষিণভাগ, ভাটেরা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # রাহীন আহমদ সালেহ, আলহাজ্ব আতাউর রহমান চৌধুরী হাফিযিয়া দাখিল মাদরাসা, ওসমানীনগর, সিলেট # হুমায়রা হোসেন সুমাইয়া, জাহানারা চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষিপাশা, চরমহল্লা, ছাতক, সুনামগঞ্জ # আহসানা জান্নাত, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # রাশেদ আহমদ, হাসিমপুর আহমদিয়া দাখিল মাদরাসা, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আবু সাঈদ মাইন, ফরিদপুর, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # হাফিজুর রহমান, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # মাহবুবা জান্নাত সামিয়া, ছকাপন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।

অদ্ভুত পৃথিবী

বাল্ট্রা

দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ইকুয়েডরের নিকটবর্তী ১৩ টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ। তারমধ্যে একটি দ্বীপের নাম হল বাল্ট্রা দ্বীপ। ঐ দ্বীপপুঞ্জের ১২টি দ্বীপ ঠিক থাকলেও বাল্ট্রা দ্বীপ শুধু ব্যতিক্রম। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল হওয়ায় সেখানে প্রায়ই বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য বৃষ্টির একটি ফোঁটাও বাল্ট্রা দ্বীপে পড়ে না। এই দ্বীপে অবস্থান করার সময় অভিযাত্রী নাবিকদের কম্পাস অস্বাভাবিকভাবে স্থির হয়ে থাকে অথবা শুধু একদিকে কাত হয়ে থাকে অথবা ভুল দিক প্রদর্শন করে। প্লেনে থাকাকালীন সময়েও একই আচরণ করে। এখান থেকে চলে গেলে আবার ঠিক হয়ে যায়। এই দ্বীপে কোন গাছ কিংবা পশুপাখি নেই। উড়ন্ত পাখিরা উড়ে এসে বাল্ট্রার কাছে এসে আবার ফিরে যায়। যেন কোন অদৃশ্য দেয়ালে বাঁধা পড়ে। অনেকে মনে করেন এই দ্বীপে অস্বাভাবিক কোন শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে। তবে আজ পর্যন্ত কেউ এর কোন সুরাহা করতে পারেননি।

হাসতে জানি

গাড়ির চাকা পাংচার হয়ে গিয়েছিলো

চারজন ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র একজায়গায় বেড়াতে গিয়ে তার পরীক্ষা মিস করল। তখন তারা একটা গল্প তৈরি করে বসলো। স্যার, আমাদের একজনের দাদী মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। পরে আসার পথে আমাদের গাড়ির চাকা পাংচার হয়ে গিয়েছিলো। তাই সঠিক সময়ে এসে পরীক্ষা দিতে পারি নাই। এবার তারা স্যারকে পরীক্ষা নেয়ার জন্যে অনুরোধ করল। বারবার অনুরোধে শিক্ষক রাজী হলেন, তবে শর্ত দিলেন যে, সবাইকে আলাদা রুমে পরীক্ষা দিতে হবে। চার জনকে চার রুমে বসিয়ে পরীক্ষা দিতে বসিয়ে দেওয়া হলো।

পরীক্ষায় কেবল একটি প্রশ্নই ছিলো, গাড়ীর কোন চাকা পাংচার হয়েছিলো?

সংগ্রহে- মো. ছাদিকুর রহমান
শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট

আবাবিল ফৌজের সদস্য হলো যারা

৩৫১২. শেখ মো. মাসুক মিয়া
পিতা: আব্দুন নূর
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: বুরাইয়া কামিল মাদরাসা
গ্রাম: সদরপুর
ডাক: লাকেশ্বর বাজার
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩৫১৩. মো. আবু সাঈদ
পিতা: আকরাম আলী
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: রাজ্জাকিয়া দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: বিশ্বম্ভরপুর
ডাক: গোবিন্দগঞ্জ
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩৫১৪. মো. রায়হান হোসেন
পিতা: মৃত মো. আব্দুল মান্নান
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা
গ্রাম: পাহাড়বর্ষিজোড়া
ডাক: মাতারকাপন
থানা: মৌলভীবাজার সদর
জেলা: মৌলভীবাজার

৩৫১৫. আবিদা ফাতেহা
পিতা: মাওলানা শাব্বির আহমদ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: হাজী ছালামত স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম: মিকিরপাড়া
ডাক: দনা বাজার
থানা: কানাইঘাট
জেলা: সিলেট

৩৫১৬. মুহাম্মদ আশরাফ হাবীব
পিতা: মাওলানা শাব্বির আহমদ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম: মিকিরপাড়া
ডাক: দনা বাজার
থানা: কানাইঘাট
জেলা: সিলেট

৩৫১৭. আমিনুল ইসলাম তানভীর
পিতা: তরিকুল ইসলাম
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল
বাসা: ২২, রোড: ৩৮, ব্লক-সি, শাহজালাল উপশহর, সিলেট

৩৫১৮. আতিকুর রহমান
পিতা: তাজ উদ্দিন
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: দুবাগবাজার হাফিজিয়া দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: কোনাগ্রাম
ডাক: সাদিমাপুর
থানা: বিয়ানীবাজার
জেলা: সিলেট

৩৫১৯. মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন
পিতা: মো. সোহাগ মিয়া
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা
গ্রাম: গাজীপুর
ডাক: কুলাউড়া
থানা: কুলাউড়া
জেলা: মৌলভীবাজার

৩৫২০. জুহায়রা জান্নাত ফেরদৌসি
পিতা: মাওলানা শামছুল হুদা
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: আল হেরা জামেয়া ইসলামিয়া
গ্রাম: মীরেরচক
ডাক: মঙ্গলকাটা
থানা: সদর
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩৫২১. আবু উবায়দা মোস্তফা শাহান
পিতা: কাজী মমিনুল ইসলাম
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: লুমিনাস একাডেমি
গ্রাম: জাহাঙ্গীরনগর
ডাক: মঙ্গলকাটা
থানা: সদর
জেলা: সুনামগঞ্জ

প্রস্তাবিত ভবন

- মসজিদ
- হিফযুল কুরআন
- প্রকাশনা
- অফিস
- ভাষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
- মাদরাসা
- ইয়াতীমখানা
- খানকাহ
- দাওয়াহ সেন্টার
- মেহমানখানা
- দারুল কিরাত
- গ্রন্থাগার
- স্টাডি সার্কেল
- মিলনায়তন
- তাখাস্‌সুস (হাদীস ও ফিক্‌হ)

مركز الفولتلى داكا

FULTOLI COMPLEX DHAKA

Khilgaon, Dhaka, Bangladesh

উস্তাযুল উলামা ওয়াল মুহাদ্দিসীন

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ-এর

৩য় বার্ষিক

ঈসালে সাওয়াব মাহফিল

২০২৫

৭
ফেব্রুয়ারি
শুক্রবার
সকাল ১০টা থেকে
পরদিন ফজর পর্যন্ত

মুহাদ্দিস ছাহেব বাড়ি
সংলগ্ন মাঠ
থানাবাজার, জকিগঞ্জ
সিলেট

প্রধান অতিথি

রাহনুমায়ে শারীয়াত ও তারীকত, মুরশিদে বরহক

হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী

বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী

আপনারা সবাই আমন্ত্রিত

ঈসালে সাওয়াব মাহফিল বাস্তবায়ন কমিটি

০১৭১৫ ৪৫৩৯৯৯, ০১৭৫১ ৬৯৮৯৫০, ০১৭১৫ ৫৭১০৭০

বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা
সর্বোচ্চ মান নিয়ে আমরা আছি আপনার পাশে

- আই.সি.ইউ
- এন.আই.সি.ইউ
- পি.আই.সি.ইউ
- পি. এইচ. ডি. ইউ
- সি.সি.ইউ, এইচডিইউ
- ডেন্টাল কেয়ার
- জেনারেল সার্জারী
- ডায়ালাইসিস ইউনিট
- নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা
- ২৪ ঘন্টা ফার্মেসী বিভাগ
- ২৪ ঘন্টা জরুরী বিভাগ
- মাদার এন্ড চাইল্ড কেয়ার
- ২৪/৭ ডায়াগনস্টিক সার্ভিস
- আই.সি.ইউ এম্বুলেন্স সার্ভিস
- ইনফার্টিলিটি (বন্ধ্যাত্ব) কেয়ার।

ওয়েসিস হসপিটাল
সোবহানীঘাট, সিলেট

Subhanighat, Sylhet

E-mail: oasishospitals@gmail.com, info@oasishospitalbd.com, Cell: 01611-990000, 01763-990055

দারুল হিকমাহ একাডেমি কমলগনজ

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ

- মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে ভর্তি
- ইসলামি ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়ে প্রণীত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষাদান
- সেমিস্টার পদ্ধতিতে শিক্ষাদান, নিয়মিত মডেল টেস্ট
- কম্পিউটার শিক্ষার সুযোগ
- নিরিবিলি পরিবেশে শিক্ষাদান
- দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী দ্বারা শিক্ষাদান
- গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজন মুক্ত ক্লাসের পড়া ক্লাসেই হাতে কলমে শেখানো ব্যবস্থা
- ইংরেজি ও আরবি স্পোকেন এর ব্যবস্থা
- নিয়মিত আখলাকী তা'লীম প্রদান
- সনদপ্রাপ্ত ক্বারীগণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষ প্রশিক্ষণ
- শিক্ষার মানোন্নয়নে ত্রি-পক্ষীয় (শিক্ষক-অভিভাবক- পরিচালনা পরিষদ) বৈঠক
- রুটিনভিত্তিক সু-শৃংখল পাঠদান ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা
- ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা, বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতা, বিতর্ক, শিক্ষা সফর ইত্যাদির মাধ্যমে সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের সুযোগ
- সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার
- গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুযোগ

নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা

প্লে শ্রেণি থেকে স্ট্যান্ডার্ড ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক : মো. আতিকুর রহমান সাকের

সীমিত আসন

স্বল্প বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ

ক্যাম্পাস | আলেপুর (আদমপুর রোড, চেকপোস্ট-এর দক্ষিণ পার্শ্বে) কমলগন্জ, মৌলভীবাজার।

যোগাযোগ: ০১৭১২-৬৮৬২৮২, ০১৭১২-৭৬৭২৮৪

আপনি কি ২০২৫, ২০২৬, ২০২৭ সালের মধ্যে
হজ্জ করতে চান?
মাত্র ৩১,০০০ টাকা জমা দিয়ে আজই প্রাক নিবন্ধন করুন
ওমরাহ্ স্পেশাল প্যাকেজ
"আমরা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিনা তবে আমরা ব্যতিক্রম"
স্বত্বাধিকারী
আলহাজ্জ মাওলানা খাজা মঈনউদ্দীন আহমদ জালালাবাদী
+88 01711 838 624
জালালাবাদ হজ্জ কাফেলা
Khaja Air Liner
খাজা
Khaja
air Liner
Travel & Tours
হজ্জ ওমরাহ্ গ্রুপ
আন্তর্জাতিক এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট এন্ড টুরস
Govt. Licn. No :253, 511, 882
IATA
ACCREDITED AGENT
Biman BANGLADESH AIRLINES APPROVED
TURKISH AIRLINES
BRITISH AIRWAYS
Emirates
QATAR AIRWAYS
SINGAPORE AIRLINES
US-BANGLA AIRLINES
REGENT
NOVOAIR
আমাদের নিজস্ব স্টক হতে সর্বনিম্ন মূল্যে বিশ্বের যে কোন গন্তব্যের বিমান টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা
সিলেট অফিস
সবুজ বিপনী (৩য় তলা) জিন্দাবাজার
01724 926 329, 01714 486796
www.khajaairliner.com
ঢাকা অফিস
হোটেল বকসি (২য় তলা). ফকিরাপুল
01724 691 177, 0248 313524
khajaairliner@yahoo.com

লতিফিয়া হিফযুল কুরআন একাডেমি ওসমানীনগর
LATIFIA HIFZUL QURAN ACADEMY OSMANINAGAR
(একটি অত্যাধুনিক মানসম্পন্ন আবাসিক হাফিজিয়া মাদরাসা)
বৈশিষ্ঠাবলী
সম্পূর্ণ আবাসিক ব্যবস্থাপনা
সুন্নতে নববীর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ
অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধান
কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক
প্রবাসী ও দূরবর্তী ছাত্রদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ
ছাত্রদের খেলাধূলা ও শরীরচর্চার সুযোগ-সুবিধা
বোর্ড পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জনের নিশ্চয়তা
সর্বোচ্চ তিন বছরে হিফজ সম্পন্ন করার নিশ্চয়তা (ইনশা আল্লাহ)
একাধিক ক্লাস টেস্ট ও বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট গ্রহণ
পাঁচ বছরে দাওরাসহ ইবি, জে.ডি.সি ও দাখিল দশম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ ও বিজ্ঞান শাখায় পাঠদানের ব্যবস্থা
প্রতিভা বিকাশের লক্ষে সাপ্তাহিক সেমিনার, সবিনা, বিতর্ক অনুষ্ঠান ও দেয়ালিকা প্রকাশ
সফলতার ১ যুগ
ভর্তি চলছে
বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ সফলতা
প্রতিবছর
১লা ডিসেম্বর থেকে ভর্তি শুরু
২রা জানুয়ারি মেধা যাচাই পরীক্ষা
নতুন ভর্তিকৃত ছাত্রদের ৫ জানুয়ারি হোস্টেলে আগমন
১লা জানুয়ারি থেকে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু
ক্যাম্পাস
দক্ষিণ তাজপুর, ওসমানীনগর, সিলেট
যোগাযোগ
মাওলানা এম.এ রব প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও প্রিন্সিপাল
মশাহিদুর রহমান প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
০১৭১৬-৯৩৯৯১৮, অফিস: ০১৭৮৫-১২৮১২৮
E-mail: moshahidurrahman@yamail.com

LATIFI HANDS

LATIFI HANDS
CHARITY WITH CLARITY

FULTALI SAHEB BARI, ZAKIGANJ, SYLHET, BANGLADESH

OUR PROJECTS

- EDUCATION
- ORPHANS
- HOUSING PROJECTS
- MASJID PROJECTS
- INFRASTRUCTURE
- SUSTAINABLE LIVELIHOODS
- AGRICULTURE SUPPORT
- WEEDING SUPPORT
- SADAQAH PROJECT
- HEALTH CARE
- EYE CARE
- GIFT
- QURBANI PROJECT
- EMERGENCY AND DISASTER RELIEF
- BLIND AND DISABLED PROJECT
- WATER PROJECT
- WIDOW SUPPORT

www.youtube.com/latifihands
www.facebook.com/latifihands

www.latifihands.org.uk

মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড ও দরসে নিজামির সমন্বিত সিলেবাসে

দাখিল নবম শ্রেণিতে

ভর্তি চলছে

সীমিত আসন

আমরা ভিন্ন কেন?

- আলিম ও দরসে নিজামির সমন্বিত সিলেবাস।
- সম্পূর্ণ আবাসিক ও সার্বক্ষণিক তদারকি।
- ইলম অর্জনের পাশাপাশি আমলে অভ্যস্ত করণের পরিবেশ।
- দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য সুবিধা গ্রহণের সুযোগ।

যোগাযোগ

01700-842680, 01772-959072
01712-904501, 01737-769053

হযরত শাহজালাল (র.) লতিফিয়া মাদরাসা, গোলাপগঞ্জ

কলেজ রোড, কদমতলী, গোলাপগঞ্জ, সিলেট

লতিফ ট্রাভেলস
লতিফ হলিডেইজ
IATA
ATAB
TOAB
TDAB
হজ্জ লাইসেন্স নং-২৪৯
ওমরা লাইসেন্স নং-৩১২
প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের ৬৩
লতিফ ট্রাভেলস
স্থাপিত : ১৯৬২
হজ্জ & ওমরা এজেন্ট
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
হজ্জ নীতিমালা অনুযায়ী (ক্রমিক নং অনুযায়ী হজ্জ যাত্রা নিশ্চিত করা হবে) পরবর্তী হজ্জের জন্য
হজ্জ রেজিস্ট্রেশন চলছে হজ্জ যাত্রা নিশ্চিত করতে আপনার
নিকটবর্তী আমাদের যেকোন শাখায় রেজিস্ট্রেশনের আজই যোগাযোগ করুন -
এয়ার টিকেট
প্যাকেজ ট্যুর
ম্যানপাওয়ার
ভিসা প্রসেসিং
হযরত শাহজালাল রোড। দরগা গেইট
হোটেল হলি ইনের পার্শ্বে। সিলেট।
০১৯৭৩৩৩০৭২৯। ০১৩১৮২১০০৭৩
১১৯-১২৪ আর.বি কমপ্লেক্স
(নীচ তলা) । পূর্ব জিন্দাবাজার । সিলেট
০৮২১-৭১৪৩২২ ০১৭১১ ৩৩০ ৭২৯
latiftravels1962@gmail.com
স্টেশন রোড । ভার্থখলা । সিলেট
০৮২১-৭১৭৪৩৭। ৭১৪৪৭৬। ৭১৫২৪৩
০১৭১১ ০০৬ ১০৫। ০১৮৪৬ ৩৯০ ৭৮৪
latiftravels@hotmail.com
১০৪-১০৯ রোজ ভিউ কমপ্লেক্স
(নীচতলা)। শাহজালাল উপশহর। সিলেট
০৮২১ ৭২৪০০৭ ০১৭১১ ৩২২২৪৪
latiftravels@gmail.com
বিয়ানীবাজার : হাজী সিরাজ ভবন, ২য় তলা কলেজ রোড, বিয়ানীবাজার। ০১৭৭১ ১৪৪ ৬৬৬
বড়লেখা : হাবীব মার্কেট (২য় তলা), পূবালী ব্যাংক সংলগ্ন, বড়লেখা। ০১৭০০ ৭৮৮ ১৫০
মৌলভীবাজার : কুসুমবাগ শপিং সিটি (নীচতলা), কুসুমবাগ, মৌলভীবাজার। ০১৭১২ ৬৮৭ ৮৭১
শমশের নগর : এম কে রহমান ট্রেড সেন্টার, স্টেশন রোড, শমশের নগর। ০১৭০০ ৭৮৮ ১৫৫
ঢাকা কর্পোরেট : হক চেম্বার, (৫ম তলা), দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা। ০১৯১২ ৫৭৭ ৪২৩
বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকে টিকেটের সঠিক মূল্য জানুন,
ঘরে বসে নিজের টিকেট নিজেই বুকিং করুন - লতিফ ট্রাভেলস পোর্টালের মাধ্যমে
Ticketing Portal : www.latiftravels.net
latiftravels.com.bd latiftravels.com @Latiftravelsroseview

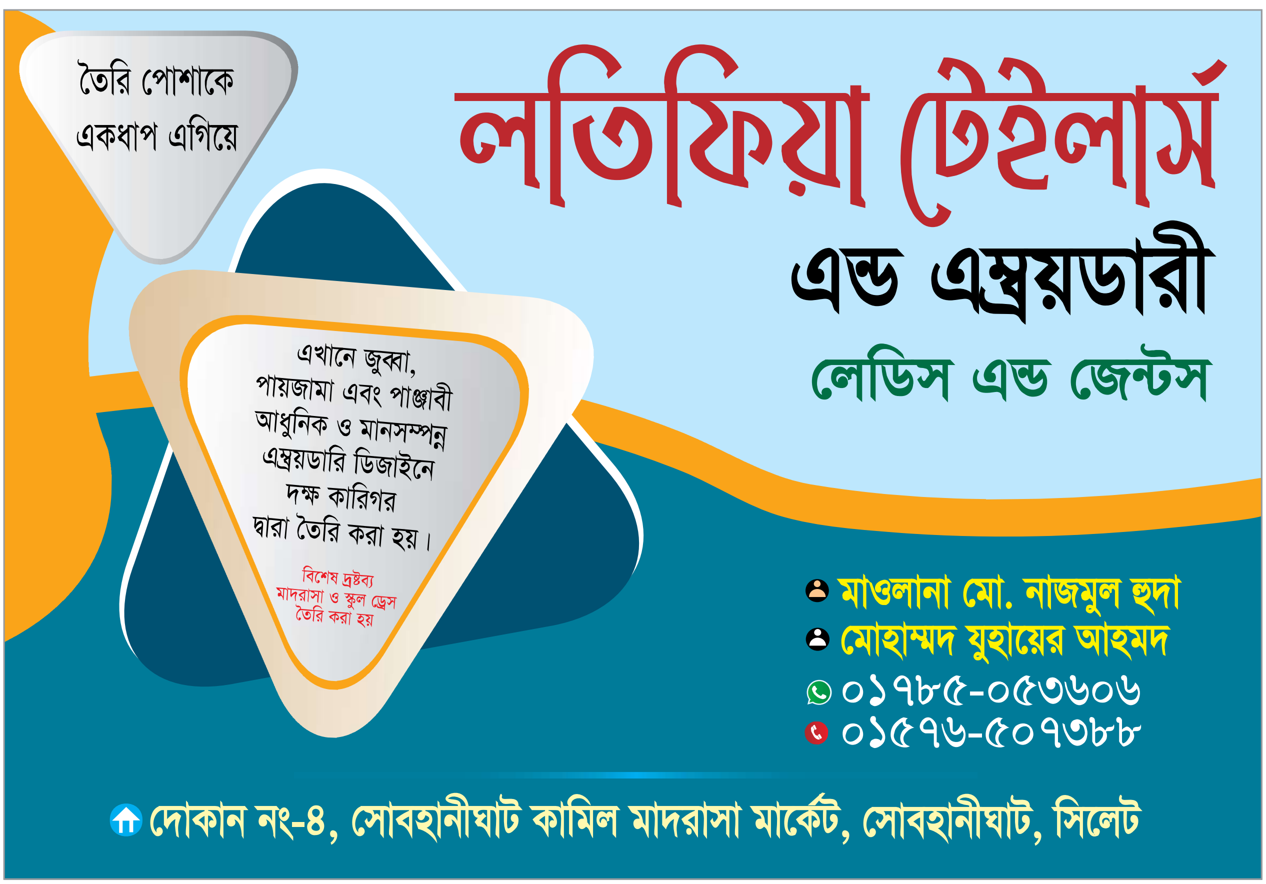

তৈরি পোশাকে একধাপ এগিয়ে
লতিফিয়া টেইলার্স
এন্ড এম্ব্রয়ডারী
লেডিস এন্ড জেন্টস
এখানে জুব্বা, পায়জামা এবং পাঞ্জাবী আধুনিক ও মানসম্পন্ন এম্ব্রয়ডারি ডিজাইনে দক্ষ কারিগর দ্বারা তৈরি করা হয়।
বিশেষ দ্রষ্টব্য
মাদরাসা ও স্কুল ড্রেস তৈরি করা হয়
মাওলানা মো. নাজমুল হুদা
মোহাম্মদ যুহায়ের আহমদ
০১৭৮৫-০৫৩৬০৬
০১৫৭৬-৫০৭৩৮৮
দোকান নং-৪, সোবহানীঘাট কামিল মাদরাসা মার্কেট, সোবহানীঘাট, সিলেট

P.O. REGD. NO. DA-1320. **THE MONTHLY PARWANA. FEBRUARY 2025**. PRICE TK. 35

Al ISLAH
CASH & CARRY

CASH & CARRY AND WHOLESALE
OPEN TO THE PUBLIC
CATERERS ONESTOP SHOP
LARGE PARKING

WE SPECIALIZE IN FULL CATERING SUPPLIES
WE SPECIALIZE FOR YOUR FULL PACKAGING SUPPLIES
RICE, FLOUR, SPICES, TIN PRODUCT, PAULTRY, LAMB, MUTTON

290-294, BISCOT ROAD
LUTON, LU3 1AZ

01582 414154
07769 778127